# বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ

ডঃ আকবর আলী খান

অনুবাদ—মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূইয়া

## সূচনা

বাংলাদেশে জাতিস্বত্ত্বার যন্ত্রণাকর ও দীর্ঘস্থায়ী অনুসন্ধান সাংবিধানিক পদ্ধতির মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়নি। বাংলাদেশ মর্মান্তিক বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে; এটা শুধুমাত্র একটি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশই ছিল না, বরং টমাস জেফারসন যাকে "সরকারের অধঃপতন" বলেছেন তার বিরুদ্ধচারিতাও ছিল।[১] জেফারসনের দৃষ্টিতে একটি আদর্শ সরকার শুধুমাত্র অনেকের শক্তিকেই বাড়িয়ে তোলে না, বরং নিজেদের যোগ্যতার পরিধিতে সবার শক্তিকেই বৃদ্ধি করে। সকল ক্ষমতা যখন "এক বা গুটিকয়েক ব্যক্তি, উচ্চ বর্ণের মানুষজন এবং অনেকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়" তখনই সরকারের অধঃপতন ঘটে। এ অধঃপতন হতে উত্তরণের পথ হচ্ছে "অনেককে" প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত করা যেখানে "প্রত্যেকেই" অন্যকে গণ্য করে এবং নিজে গণ্য হয়। সরকারী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ পৃথিবীর সর্বত্রই বিপ্লবীদের মধুরতর স্বপ্ন ছিল।

বাংলাদেশে বিপ্লবের আশা আকাঙ্খা সংবিধানের মধ্যেই রূপ লাভ করেছে। সংবিধানের ১৪ ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের একটি মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে "সব ধরনের শোষণ হতে মেহনতি জনতা, কৃষক-শ্রমিক ও জনগণের পশ্চাৎপদ অংশের মুক্তি।" সংবিধানের ১৬ ধারা মতে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার মধ্যে বৈষম্য হ্রাস এবং "পল্লী এলাকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও- - - -" সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে নির্দেশিত হয়েছিল। ১৯ ধারা "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য" কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা নির্দেশ করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশ গ্রহণ জাতীয় মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়।

এই প্রবন্ধটিতে মেহনতি জনতার মুক্তির আড়ম্বরপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হবে। এটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী উন্নয়নের

প্রচেষ্টাকে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভাবিত করে তা' প্রথম অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির জন্য সরকারের নেয়া উদ্যোগের পর্যালোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচিত হয়েছে স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদ্ভাবনসমূহ যা বিকেন্দ্রীকরণকে ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ (এন,জি,ও) কর্তৃক পরিচালিত কার্যকরী বিকেন্দ্রীকরণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহ। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পঞ্চম অধ্যায়ে নিরীক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের একটি এন,জি,ও-গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সফল উদ্ভাবনার উপর লিখিত একটি ঘটনা সমীক্ষার অভিমতের সংক্ষিপ্তসার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে প্রধান প্রধান প্রতিপাদিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই সমীক্ষার নীতিগত তাৎপর্য কি তা বর্ণনা করা হয়েছে।

## ১। সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ (আয়তন ১৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার ; আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ৮৯তম দেশ), কিন্তু তার দারিদ্রের পরিধি ব্যাপক। বাংলাদেশ হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশের (এল,ডি,সি) মধ্যে সবচে' জনবহুল দেশ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ দেশ। পুরাদস্তর বঞ্চনার মধ্যে বেঁচে আছে এর দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী। সরকারী হিসেব মতে জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৩ ভাগ মানুষ গড় প্রয়োজনীয় (প্রতিদিন ২২০০ কিঃ কেলোরী) কেলোরী থেকে কম আহার গ্রহণ করে (সারণী-১)।

### সারণী—১

### দারিদ্রসীমার নীচে কেলোরী গ্রহণকারী জনসংখ্যা ও খানার শতকরা হার

১৯৮১-৮২

| প্রতিদিন কেলোরী গ্রহণ (কিঃ কেলোরী) | বাংলাদেশে খানার শতকরা হার | | | বাংলাদেশে জনসংখ্যার শতকরা হার | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | বাংলাদেশ | শহর এলাকা | পল্লী এলাকা | বাংলাদেশ | শহর এলাকা | পল্লী এলাকা |
| ১৬০০-এর নীচে | ২৯ | ১৯ | ৩১ | ৩০ | ২১ | ৩১ |
| ১৮০০-এর নীচে | ৪৪ | ৩৪ | ৪৫ | ৪৫ | ৩৭ | ৪৭ |
| ২২০০-এর নীচে | ৭১ | ৬৩ | ৭৩ | ৭৩ | ৬৭ | ৭৪ |

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ খানা খরচ জরিপ প্রতিবেদন, ১৯৮১-৮২ (ঢাকাঃ বিবিএস, ১৯৮৬), পৃঃ ৪৪।

যা হোক, বাংলাদেশে দারিদ্রের প্রবণতা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। একটি সমীক্ষায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে বাংলাদেশে "অতি দরিদ্রের শতকরা হার ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ৪০·২ ; ১৯৭৫ সালে তা ৬১·৮-এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান দুর্দশার এই অনুকল্প অন্য একটি সমীক্ষা দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে অতি দরিদ্রের (যারা গড়ে প্রতিদিন ২০৮৭ কিঃ-কেলোরীর নীচে খাবার গ্রহণ করে) শতকরা হার ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ৫২ এবং তা ১৯৭৭-৭৮ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭·৯তে দাঁড়িয়েছে।[৩] যাহোক, তৃতীয় একটি সমীক্ষার সাথে এসব প্রতিপাদিত বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাতে নির্দেশিত হয়েছে যে, গ্রাম বাংলায় ১৯৬৩-৬৪তে দরিদ্ররা ছিল শতকরা ৯২ ভাগ এবং ১৯৭৩-৭৪-এ তা নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৩-তে।[৪] অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত সর্বশেষ খানা-খরচ জরীপে দেখা যায় যে, ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে দারিদ্রসীমার নীচে জনসংখ্যা এবং খানার হারের মধ্যে পরিসংখ্যানগত কোন উল্লেখযোগ্য তারতম্য নেই।[৫] ধরা যেতে পারে যে "দারিদ্র্য রেখা"-র সংজ্ঞা সম্পর্কে ঐক্যমতের অভাবের জন্যই এসব হিসেবে বিপুল তারতম্য দেখা যায়।

যদি এটাও মনে করা হয় যে, গত দশকে দরিদ্রের অনুপাত স্থির রয়েছে, তবু বলা যায় যে দারিদ্র্য সীমার নীচে মানুষজনের সংখ্যা বেড়ে গেছে, যেহেতু জনসংখ্যার নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটেছে (বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মতে বছরে শতকরা ২·৪)। বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষার হিসেব মতে যদিও পুরো জন-সংখ্যার বিচারে দারিদ্রের আনুপাতিক হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি তবু ১৯৭৪ সালের তুলনায় ১৯৮১ সালে ৮ মিলিয়ন দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬] আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে দারিদ্রের ব্যাপ্তি সত্ত্বেও গড় আয়ু বেড়ে গেছে। ১৯৬০ সালে জন্মকালে সম্ভাব্য গড় আয়ু ছিল ৩৭ বৎসর ; ১৯৮৬ সালে বেড়ে হয়েছে ৫০ বৎসর। জীবনমান উন্নয়নের বদলে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও নিবারণ ব্যবস্থার অধিকতর ব্যবহারই বর্ধিত সম্ভাব্য গড় আয়ুর কারণ বলে ধরা যেতে পারে। মৃত্যুহারের হ্রাস জনসংখ্যা বিস্ফোরণে তার ভূমিকা রেখেছে যা অর্থনীতিকে নিম্নস্তরের ভারসাম্য ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছে।

আপাতদৃষ্টিতে সমরূপ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে দরিদ্ররা সমরূপী নয়। দরিদ্রদের নিজেদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে। মাইকেল লিপটনের মতে বাংলাদেশের দরিদ্রদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) "অচরম দরিদ্র" এবং (২) "চরম দরিদ্র"।[৭] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাদেরকেই "চরম দরিদ্র" বলে আখ্যায়িত করা যায় যাঁরা প্রতিদিন ১৬০০ কিঃ কেলোরীর (মৌলিক বিপাকীয় কেলোরী প্রয়োজনীয়তা) চাইতে কম আহার গ্রহণ করে। যাঁরা গড় কেলোরী প্রয়োজনীয়তার শতকরা ৮৫ ভাগ (প্রতিদিন ১৮০০ কিঃ কেলোরী) গ্রহণ করে তাঁদেরকে অচরম দরিদ্রের ভাগে ফেলা যেতে পারে। এই বিন্যাস

অনুসারে বাংলাদেশে কম পক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ লোক চরম দরিদ্র (সারণী-১ দেখুন)। শুধুমাত্র শতকরা ১৫ ভাগ লোক অচরম দরিদ্র। ফলে বাংলাদেশে চরম দরিদ্রদের সমস্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর তীব্র ও গভীর।

এমনকি চরম দরিদ্র পরিবারেও দারিদ্র্য সবাই সমভাবে ভোগ করে না। ধনী ও দরিদ্র উভয় প্রকার পরিবারেই শিশু এবং মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। ফলে বাংলাদেশে জন্ম হতেই বহু সংখ্যক শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। চার বছর বয়স পর্যন্ত চার ভাগের তিন ভাগ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং তারা রক্তাল্পতায় ভোগে। কোন একটি বছরে জন্ম নেয়া শিশুদের শতকরা ২০ ভাগেরও কম শিশু স্বাস্থ্যবান, শারীরিকভাবে কর্মক্ষম এবং পুরোপুরি উৎপাদনক্ষম নাগরিক হওয়ার সুযোগ পায়।[৮] মহিলারাও অপুষ্টিতে ভোগে। "ধনী বা দরিদ্র, হিন্দু বা মুসলমান যা-ই হোক না কেন একটা বিপত্তি তাদের সবার ক্ষেত্রেই সমান—সবার শেষে খাওয়া এবং প্রায়শঃই সবচে' কম খাওয়া—।"[৯] পূর্ণ বয়স্ক নারীদের কেলোরী গ্রহণ (গর্ভ ও স্তনদান প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় না এনেই) পুরুষদের তুলনায় ২৯% ভাগ কম এবং ৫ বছরের নীচে মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে ১৬% কম এবং ৫-১৪ বছরের মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রায় ১১% কম। ছেলে শিশুদের চাইতে মেয়ে শিশুদের অপুষ্টির হার প্রায় ৩ গুণ বেশী এবং তীব্র অপুষ্টিতে ভোক্তাদের বেলায় মৃত্যু হার ৪৫% ভাগ বেশী।[১০] দারিদ্রের এই উত্তরোত্তর ব্যাপকত্বের সাথে রয়েছে আয় এবং সম্পদের বৈষম্যের বৃদ্ধি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আয় বন্টনের জিনি সূচক ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ০·৩৬ এবং ১৯৮১-৮২তে তা' বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০·৩৯তে (সারণী-২)।

## সারণী-২

### খানা জনসংখ্যা প্রতি দশক-এ আয়ের শতকরা হার
### ১৯৬৩-৬৪,১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৮১-৮২

| খানা দশক | বাংলাদেশ | | | শহর | | | পল্লী | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৬৩-৬৪ | ১৯৭৩-৭৪ | ১৯৮১-৮২ | ১৯৬৩-৬৪ | ১৯৭৩-৭৪ | ১৯৮১-৮২ | ১৯৬৩-৬৪ | ১৯৭৩-৭৪ | ১৯৮১-৮২ |
| সর্বনিম্ন ৫% | ১.২ | ১.২ | ১.১২ | ১.০ | ১.৬ | ১.০৯ | ১.৩ | ০.৮ | ১.১৬ |
| দশক-১ | ১.২ | ২.৮ | ২৭.৬ | ২.৮ | ৩.২ | ২.৬৯ | ৩.৩ | ২.৪ | ২.৮৪ |
| দশক-২ | ৪.৫ | ৪.২ | ৩.৮৮ | ৩.৬ | ৩.৬ | ৩.৫২ | ৫.২ | ৪.৮ | ৪.২৭ |
| দশক-৩ | ৪.৬ | ৫.৪ | ৪.৮৩ | ৪.৫ | ৫.২ | ৪.৩৯ | ৫.৩ | ৫.৬ | ৫.৩৪ |
| দশক-৪ | ৬.১ | ৫.৯ | ৫.৮৯ | ৫.৮ | ৫.৮ | ৫.৪৭ | ৫.৮ | ৬.৩ | ৬.৩৭ |
| দশক ১-৪ | ১৮.৪ | ১৮.৩ | ১৮.৪৮ | ১৬.৭ | ১৭.৮ | ১৬.০৭ | ১৯.৬ | ১৯.১ | ১৮.৮২ |
| দশক-৫ | ৭.৩ | ৭.১ | ৬.৯৩ | ৫.৯ | ৭.২ | ৬.৪৪ | ৮.৩ | ৭.১ | ৭.৪৭ |
| দশক-৬ | ৭.৩ | ৮.০ | ৮.২৭ | ৭.৫ | ৮.৮ | ৭.৮৯ | ৮.৩ | ৮.০ | ৮.৭১ |
| দশক-৭ | ১০.৭ | ১০.০ | ৯.৯৫ | ৮.৯ | ১০.০ | ৯.৬৭ | ১০.০ | ৯.৮ | ১০.২৬ |
| দশক-৮ | ১০.৬ | ১২.৮ | ১২.১৭ | ১১.৫ | ১২.০ | ১২.০২ | ১১.৮ | ১৩.৫ | ১২.৩০ |
| দশক-৯ | ১৪.৭ | ১৬.০ | ১৫.৭৯ | ১৬.৫ | ১৬.০ | ১৫.৮৪ | ১৫.০ | ১৬.১ | ১৫.৭৩ |
| দশক-১০ | ৩১.০ | ২৮.৪ | ২৯.৫৩ | ৩৩.০ | ২৯.২ | ৩২.০৬ | ২৭.০ | ২৬.৪ | ২৬.৬৯ |
| সর্বোচ্চ ৫% | ২০.৪ | ১৬.৪ | ১৮.৯৫ | ২১.১ | ১৮.৬ | ২০.৮৯ | ১৭.২ | ১৬.০ | ১৬.৭৮ |
| জিনি সূচক | ০.৩৬ | ০.৩৬ | ০.৩৯ | ০.৪১ | ০.৩৮ | ০.৪১ | ০.৩৩ | ০.৩৬ | ০.৩৬ |

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ খানা ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন ১৯৮১-৮২, পৃঃ ২০।

সর্বনিম্ন শতকরা ৪০ ভাগ খানার ক্ষেত্রে মোট আয়ে তাঁদের অংশ ১৯৬৩-৬৪তে ছিল শতকরা ১৮·৪ ভাগ এবং ১৯৮১-৮২তে তা' দাঁড়িয়েছে ১৭·৩৬ ভাগে (সারণী-২)। ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৭ সালে সর্বনিম্ন শতকরা ৪০ ভাগ কৃষি খানা শতকরা মাত্র ১৩·৩ ভাগ জমি চাষ করত। পুরো আবাদী ভূমির ক্ষেত্রে এই গ্রুপের অংশ ১৯৮৩-৮৪ সালে শতকরা ৭·৬ ভাগে নেমে যায় (সারণী-৩)।

## সারণী-৩

### বাংলাদেশে প্রধান কৃষি খানা গ্রুপ কর্তৃক জমি আবাদের বন্টন ১৯৭৭-৮৪

| গ্রামীণ খানার শতকরা বর্গ | | ১৯৭৭ জমি আবাদ (০০০ একর) | শতকরা হার | ১৯৮৩-৮৪ জমি আবাদ (০০০ একর) | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|---|
| সর্বনিম্ন | ৪০% | ২৯২৫ | ১৩·৩ | ১৭১৪ | ৭·৬ |
| নিম্নমধ্য | ৪০% | ৭৯৪৫ | ৩৬·১ | ৮১৭৪ | ৩৬·১ |
| উচ্চমধ্য | ১৫% | ৬৩০১ | ২৮·৭ | ৬৮৪৬ | ৩০১·১ |
| উচ্চ | ৫% | ৪৭৮৮ | ২১·৯ | ৫৯৪৪ | ২৬·২ |
| মোট | ১০০% | ২১৯৫৯ | ১০০·০০ | ২২৬৭৬ | ১০০·০ |

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ কৃষি ও গবাদি পশু শুমারী, ১৯৮৩-৮৪ (ঢাকা, বিবিএস, ১৯৮৬), পৃঃ-৩২।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হচ্ছে ব্যাপক ভাগ চাষ। শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ জমি বর্গাচাষীরা চাষ করে। শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই প্রজাস্বত্ত্ব চুক্তি বাৎসরিক এবং প্রজারা উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ পায়, যদিও তারা নিজেরাই সকল উপকরণের ব্যয় বহন করে। এতদ্‌পর্যন্ত নেয়া ভূমি সংস্কারের সমস্ত উদ্যোগই ছিল দায়সারা গোছের। ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-তে ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা (প্রায় ৩৪ একর) থেকে হ্রাস করে ৬০ বিঘা (প্রায় ২০ একর) করা হয়েছে। যা হোক, এই সর্বোচ্চ সীমা শুধুমাত্র নতুন জমির স্বত্ত্বাধিকারী হবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিরাজমান মালিক যাঁদের জমি ২০ একরের অধিক তাঁদেরকে সেই অতিরিক্ত জমি রাখার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ভাগ চাষের জন্য সকল মালিকদের চাষের খরচ প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে এ সকল আইন এখনো কার্যে পরিণত করা হয়নি। সমভাবে কৃষি শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরী আইন এখনো নিষ্ক্রিয় আইন হিসেবেই বিরাজ করছে।

ভূমিহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তর এবং ফলে ধনী ও দরিদ্রের দূরত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি ও গবাদি পশু শুমারী অনুসারে বাংলাদেশের শতকরা ৫৬·৪ ভাগ খানা ভূমিহীন। এই জরীপে তিন ধরনের ভূমিহীন চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম ধরনে আছে সেই রকম খানা যাদের কোন ভূমিই নেই। এই মানদণ্ডে শতকরা ৮·৭ ভাগ খানা ভূমিহীন। দ্বিতীয় ধরনে রয়েছে সে সব খানা যাদের বসতবাটির জমি রয়েছে কিন্তু অন্য কোন জমি নেই। এই শ্রেণীতে রয়েছে শতকরা ১৬·৬ ভাগ খানা। তৃতীয় ধরনের ভূমিহীন খানায় রয়েছে তারা যাদের বসতবাটির জমি আছে এবং তাছাড়া অনধিক ০·৫০ একর অন্য জমি রয়েছে। এই শেষ শ্রেণীতে রয়েছে শতকরা ২৮·২ ভাগ খানা। প্রতি বছর প্রায় শতকরা ৫ ভাগ হারে ভূমিহীনতা বেড়ে যাচ্ছে। গত প্রজন্মে এটা প্রায় দ্বিগুণেরও অধিক বেড়ে গেছে এবং ধারণা করা যাচ্ছে যে এটা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে যাবে।

কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব এই ভূমিহীনতার সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মতে ১৯৭৯-৮০ সালে ৮·৫ মিলিয়ন মানুষ কার্যতঃ কর্মহীন ছিল। প্রতি বছর নতুনভাবে ০·৮ মিলিয়ন নতুন লোক শ্রম বাজারে যুক্ত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা সিরিয়া, সুইডেন, পর্তুগাল বা অষ্ট্রিয়ার পুরো জনসংখ্যার চাইতে অধিক। নরওয়ে, নিউজিল্যাণ্ড এবং ইসরাইলের যুক্ত জনসংখ্যার চাইতে এই বেকারদের সংখ্যা বেশী।

আয়ের অসম বন্টন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব শুধুমাত্র সামাজিক কাঠামোর বিনাশই সাধন করে না বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে রুদ্ধ করে দেয়। জনগণের দারিদ্র ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে ; ফলে বাজারের আয়তন সংকুচিত হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বৈষম্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায়ও বিপত্তি ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ বড় ভূস্বামীদের বর্গাচাষ প্রদান অপ্রতুল জমির দক্ষ ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে। সমভাবে পানির উপর একাধিপত্য বা কৃষি উপকরণের উপর গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্য সেচ প্রকল্পগুলোর সেচ-এলাকার হ্রাস ঘটায়।

যে মেরুকরণ প্রক্রিয়া ধনীকে আরো ধনী, দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করে তুলছে তা দারিদ্রের একটি কারণ এবং সেই সাথে এর পরিণামও বটে। দরিদ্রদের এবং বহিরাগত শুভাকাংখীদেরও এই শক্তিশালী বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন করার কোন শক্তি নেই। স্থানীয় এলিটবর্গ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফায়দা নিজেরা কব্জা করে ; তারা দরিদ্র ও বহিঃ বিশ্বের মাঝে "জাল" হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার গ্রামীণ এলিটদের উপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দুর্দশাগ্রস্থদের জন্য নির্ধারিত ত্রাণ সামগ্রী গায়েব হয়ে যায় এবং দরিদ্রদের জন্য চিহ্নিত কর্মসূচী স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদেরকেই ধনী করে।[১১] এই শোষণ প্রক্রিয়া সর্বদাই অহিংস নয়। স্থানীয় এলিটবর্গ প্রায়শঃ আইন

বহির্ভূত পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের প্রভাব টিকিয়ে রাখে এবং রবার্ট চেম্বারস্ যাকে "ডাকাতি" বলেছেন, সময় সময় তারা তাতেই প্রবৃত্ত হয়।[১২] দরিদ্রদের লুণ্ঠন করার জন্য প্রতারণা, জোচ্চুরি এবং সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়; তাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। ১৯৭০-এর গ্রামীণ বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামোর উপর একটি ঘটনা সমীক্ষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, "মধ্য ও গরীব কৃষকদেরকে নিপীড়ণ করার ক্ষেত্রে আদালত ধনী কৃষকের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।"[১৩]

হার্টম্যান ও বইসের ভাষায় বাংলাদেশকে "নিশঃব্দ সহিংসতা" দখল করেছে। বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ নিশ্চলতার তীব্র সহিংসতার সম্মুখীন হয় যা প্রয়োজনহীন ক্ষুধাকে স্থায়ী করে তোলে।[১৪] এই অপরিবর্তনীয় অবস্থাজাত সহিংসতাকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে---কাঠামোগত সহিংসতা এবং কাঠামো বহির্ভূত সহিংসতা।[১৫] কাঠামোগত সহিংসতায় অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে অন্যায্য মজুরী, অত্যন্ত উচ্চহারে অর্থলগ্নী, ভাগ চাষের অত্যন্ত অননুকূল শর্ত, মাতব্বরের অত্যাচার, বাধা শ্রমিক, শিশু শ্রমিক, বিনামূল্য সেবা, অস্পৃশ্যতা এবং যৌতুক। দ্বিতীয় ধরনের সহিংসতায় রয়েছে (১) আইনগত সহিংসতা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় এজেন্ট কর্তৃক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শক্তির বৈধ ব্যবহার; (২) রাষ্ট্রীয় এজেন্ট কর্তৃক বেআইনী সহিংসতা; (৩) গ্রামীণ দরিদ্রদের বিরুদ্ধে শক্তিধর ব্যক্তি বা গ্রুপের বেআইনী সহিংসতা; (৪) গ্রামীণ দরিদ্রদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সহিংসতা। সহিংসতার এই আবহ গ্রামীণ এলিটবর্গ তাঁদের নিজেদের স্বার্থে সর্বদা লালন করে। স্থানীয় এলিটবর্গের পক্ষে শুধুমাত্র নিজের শক্তিতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাঁরা বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণে আইনের ছড়াছড়ি থাকা সত্বেও অর্থনীতিতে গ্রামীণ এলিটবর্গ তাঁদের মরণ কামড়কে আরো জোরদার করছে। একে গুনার মিরডাল "নরম রাষ্ট্রের" লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে নরম রাষ্ট্র "সব ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলার সাথে আপোষ করে---যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আইনের ত্রুটির মধ্যে, বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরে সরকারী কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরিত আইন এবং নির্দেশের ব্যাপক অমান্যকরণে এবং যে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও গ্রুপের আচরণ তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত তাঁদের সাথে এই সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে- - - - -। এই বিভিন্ন ধরনের আচরণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তারা প্রত্যেকে পরস্পরকে বাড়িয়ে তোলে, এমনকি একটি আরেকটির জন্ম দেয়। ফলে তাদের একটি সম্মিলিত চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে।"[১৬]

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রায়শঃই কেলেকির ভাষায় "একটি মাধ্যমিক শাসন" বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৭] এই মাধ্যমিক শাসনামলের রাজনীতিতে নিম্নমধ্য ও ধনী কৃষকদের আঁতাতের

আধিপত্য বিদ্যমান থাকে। পর্যাপ্ত সম্পদশালী দেশে এই ধরনের জোট একটি স্থিতিশীল সামাজিক পরিস্থিতির জন্ম দেয়। যা হোক, যে সব দেশে উন্নয়নের স্তর খুব নীচু, যেখানে একটি গ্রুপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি নিস্ফল প্রচেষ্টায় দাঁড়ায়, সেখানে এই মাধ্যমিক শাসনামলের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। অপর্যাপ্ত সম্পদ লাভ করার জন্য কামড়াকামড়ি রাজনৈতিক পদ্ধতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ফলে জন্মের পর হ'তেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ক্যু ও পাল্টা ক্যু সাংবিধানিক পদ্ধতিকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে। জাতীয় রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা স্থানীয় এলিটবর্গের ক্ষমতাকে জোরদার করে তুলেছে।

## ২। সরকারী উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ের সমবায় প্রতিষ্ঠান

বৃটিশ রাজ দক্ষিণ এশিয়ায় নৈশ প্রহরীর নীতির প্রচলন ঘটিয়ে ছিল। মূলতঃ তাঁরা বিরাজমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং আইন শৃঙ্খলা প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটে ষাটের দশকে। আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে তা' পরিচালিত হয়। সাধারণভাবে "কুমিল্লা মডেল" নামে খ্যাত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছিল চারটি অংশ ঃ প্রতি থানায় থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি), রাস্তা, খাল/নালা এবং বাঁধ নির্মাণের জন্য পল্লীপূর্ত কর্মসূচী (আর ডব্লিউ পি), থানা সেচ কর্মসূচী (টিআইপি) নামে পরিচিত থানা কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র পর্যায়ে সেচ কর্মসূচী এবং থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (টিসিসিএ)-এর অধীনে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতি। এই মডেলের মূল উপাদানগুলোর অধিকাংশের মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না। এই মডেলের শক্তি নিহিত রয়েছে নতুন ধ্যান ধারণা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় যুগ যুগ ধরে লালিত প্রশাসনিক পদ্ধতির মধ্যে কার্যকর সন্নিবেশনের মধ্যে। সুদূর অতীতে চানক্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩য় শতাব্দী) পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর আলোচনা খুঁজে পাওয়া যাবে। রাষ্ট্র পরিচালিত কৃষি ঋণ খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর মহাস্থানগড় শিলালিপির মতই প্রাচীন।[১৯] উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে ক্ষুদে কৃষকদের জন্য যে রেইফেই-সেন সমবায় প্রসার লাভ করেছিল তার দ্বারাও এ মডেল প্রভাবিত হয়েছে।[২০]

জাপানের কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই মডেলের মৌলিক বিষয়াদি নিম্নরূপ ঃ

(ক) ঐতিহ্যবাহী ও উন্নয়ন প্রশাসনের সংমিশ্রণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এবং উন্নয়ন প্রশাসনের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়া কুমিল্লা মডেল প্রত্যাখ্যান করে। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ঐতিহ্যিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রশাসনে সহজাত দুর্বলতা রয়েছে, তবু ধারণা করা যায় যে, একে বাদ দিলে ফল উল্টো হবে।[২১] এর ফলে এই মডেলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রশাসন, স্থানীয় সরকার এবং

উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। স্থানীয় পর্যায়ে সমস্ত এজেন্সীর মধ্যে জোরদার সমন্বয় সাধনার্থে সরকারী সদস্য এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে স্থানীয় সরকারের একটি নতুন স্তর 'থানা কাউন্সিল' সৃষ্টি করা হয়।

(খ) পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণ। আখতার হামিদ খান যথার্থই জোর দিয়ে বলেছেন যে,"- - - - - - - - - - - - পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, সেচ কর্মসূচী এবং সমবায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক খুব গভীর এবং জরুরী। প্রথমোক্ত দুটি কর্মকাণ্ড জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে। সমবায় তাঁদেরকে মহাজনের খপ্পর হ'তে রক্ষা করে এবং তাদেরকে কৃষি পদ্ধতির আধুনিকায়নে সক্ষম করে - - - -। পূর্ত কর্মসূচী যদি বিঘ্নিত হয় বা সেচ কর্মসূচী যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তবে সমবায়েরও পরিসমাপ্তি ঘটে।"[২৩]

(গ) বহুমুখী বহিরাগত পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট-এর পরিবর্তে একমুখী অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট। যে সকল গোঁড়া সমাজ উন্নয়ন এবং কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি পরিবর্তন আনয়নকারী হিসেবে বাইরে প্রশিক্ষিত লোকজন নিয়োগের সুপারিশ করে কুমিল্লা মডেল তার পক্ষে নয়। এসব বহিরাগতগণ সমাজের সাথে একাত্মতা বোধ করে না। তারা প্রায়শঃই দুর্নীতিপরায়ণ এবং ক্ষুদ্রমনা। আখতার হামিদ খান জোর দিয়ে বলেছেন, "শিক্ষিত লোকজনকে গ্রামে পাঠানোর প্রচেষ্টা অর্থহীন- - - - - - - - - -। কার্যতঃ তা'হচ্ছে কোন নদীকে উজানে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা। গ্রামে লক্ষ্যণীয় যে প্রবণতা এবং মনে হয় তা অপরিবর্তনীয় প্রবণতা---তা হচ্ছে সবচে ভালো লোকজন গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কোন কিছু তাদেরকে নিরস্ত করতে পারে না, তাঁরা যেতেই থাকে।"[২] তাছাড়াও সারথী প্রকল্পগুলোতে যে সামাজিক যোগাযোগের জটাজাল বিদ্যমান তার একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে গ্রামে কোন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব বা অবিসংবাদিত নেতার অস্তিত্ব নেই। একজন সাধারণ গ্রামবাসী সর্ব বিষয়ে একজন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে না বরং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে। সেজন্যেই পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট হিসেবে বহুমুখী কর্মীরা কার্যকর নয়। কুমিল্লা মডেল তাই গ্রামের ভেতর থেকে ছয় ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টিকারী এজেন্টকে কাজে লাগিয়েছে ঃ সমবায় সমিতির ম্যানেজার, আদর্শ কৃষক, হিসাব রক্ষক, শিক্ষক, মহিলা সংগঠক এবং দোকানদার।

(ঘ) গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম এই বিশ্বাস। কুমিল্লা মডেলের ধারণাগত ভিত্তি হচ্ছে এই যে, গ্রামবাসীরা খাল কাটা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজেরাই অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। সরকারী এজেন্সীর মাধ্যমে এ সকল স্কীমের বাস্তবায়ন খরচের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলবে এবং প্রকল্পের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণকে অবহেলিত রাখবে।

(ঙ) প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ। কুমিল্লা মডেলের সাফল্য নির্ভর করে অবিরাম প্রশিক্ষণের উপর। প্রশিক্ষণ এবং সেবাকে সংযুক্ত করার জন্য টিটিডিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়। খান দেখিয়েছেন যে, "বৃটিশ আমলে থানা এবং জমিদারের কাঁচারী ছিল সরকার, আইন শৃঙ্খলা এবং রাজস্ব আদায়ের প্রধান প্রতীক। থানা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কেন্দ্রকে নতুন প্রতীক হিসেবে গঠন করা হয়। গ্রামীণ জনগণের অগ্রগতির জন্য সরকারের নতুন চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন টিটিডিসি। সত্যিকারের অংশীদারিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল এই অগ্রগতি। সরকারী বিশেষজ্ঞগণকে এতে জনগণের শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক হতে হতো, জনগণের নেতাদেরকে পরিকল্পনা এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করতে হতো। জনগণের সুবিধার্থে সব ধরনের সেবা সরবরাহ এবং বিশেষজ্ঞদেরকে একই ভবনে অবস্থিত হতে হতো।"[২৫]

(চ) বহুমুখী বহুস্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি হতে একমুখী দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মূল কারণগুলো দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ঐতিহ্যিক বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলো ১০ থেকে ১৫টি গ্রাম থেকে সদস্য নির্বাচন করতো--- যেখানে দশ থেকে পনেরো হাজার লোক বাস করতো। এরকম সমিতিতে দলীয় সংহতি হতো খুবই দুর্বল। খানের মতে, "সদস্যদের মধ্যেও নামমাত্র সম্পর্ক বিদ্যমান থাকত, তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করতো। কোন সামাজিক সুসংহতি, কোন ঐক্যই পরিলক্ষিত হতো না - - - কোন বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তা আর সমবায় থাকে না ; একটা কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।"[২৬] দ্বিতীয়তঃ, বহুমুখী সমবায় সমিতি সৃষ্টির বেলায় ধরে নেয়া হয় যে সামাজিক সম্প্রীতি রয়েছে এবং সেখানে বিভিন্ন লক্ষ্যের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সহযোগিতা করতে পারে। খানের মতে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির লক্ষণ হচ্ছে "ঝঞ্চাপূর্ণ অর্থনৈতিক লড়াই।"[২৭] খানের বিশ্লেষণ মতে গ্রামের তিনটি প্রধান শ্রেণী-বৃহৎ মালিক, কৃষক মালিক এবং ভূমিহীন শ্রমিক—এদের মধ্যে সুসংহতি বিদ্যমান নেই। ক্ষুদে কৃষক যাঁরা অধিক ফসল ফলানোর ব্যাপারে উৎসাহী তাঁদেরকে একমুখী গ্রামীণ সমবায় সমিতিতে সংগঠিত করা দরকার। যা হোক, বহুস্তর বিশিষ্ট কাঠামোতে যেখানে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রাম হতে অনেক দূরের কোন দপ্তরে নেয়া হয় সেখানে ছোট সমবায় বাঁচতে পারে না। সে জন্যেই থানা স্তরে সমষ্টিবদ্ধ দ্বিস্তরবিশিষ্ট সমবায় সংগঠিত করা হয়।

(ছ) বাহির হতে সম্পদ প্রবাহ ঃ যদিও এ মডেলে সম্পদ আহরণের জন্য ক্ষুদে চাষী কর্তৃক স্বল্প সঞ্চয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে তবু এটা স্বীকার করে যে, অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য সুবিধাদির জন্য স্থানীয়ভাবে সম্পদ যোগাড় করা সম্ভব নয়, উপর থেকে এ সম্পদ প্রদান করতে হবে। খান লিখেছেন, "পল্লী উন্নয়ন পূর্ববর্তী উদ্যোগগুলোর ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের প্রায় সর্বত্রই বলা হয়েছে, তাঁরা

নিজেরাই নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে। আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, এটা ছিল ভণ্ডামী এবং ভ্রান্ত উপদেশ। গ্রামবাসীদের জন্য সরকারের অনেক বিনিয়োগ করা প্রয়োজন; সেচ সুবিধা, বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি, একটি ঋণ দান পদ্ধতি ইত্যাদি গড়ে তোলা দরকার যাতে পল্লী এলাকার উন্নয়ন ঘটে।"[২৮]

কুমিল্লা মডেল পল্লী উন্নয়নের জন্য প্রথম তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। মডেলের তিনটি উপাদান, যথা---টিটিডিসি, আরডব্লিউপি, টিআইপি বাংলাদেশের জন্মের আগেই সারা দেশে প্রসার লাভ করে। দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রথমে কুমিল্লা জেলায় করা হয়েছিল এবং জাতীয় ভাবে এটা একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) হিসেবে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) মাধ্যমে এই কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠানিক রূপদান করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের জুন মাসের মধ্যে বিআরডিবি'র ইউসিসিএ-কে,এস,এস (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি---কৃষি সমবায় সমিতি) দ্বিস্তর বিশিষ্ট কর্মসূচী প্রায় সারা দেশে প্রসার লাভ করে। ৪৪৮টি ইউসিসিএ এবং প্রায় ২·৩ মিলিয়ন সদস্য সমন্বিত ৬২ হাজার কে,এস,এস বর্তমানে চালু আছে।

স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, সারথী এলাকায় (কুমিল্লা কোতোয়ালী উপজেলা) কুমিল্লা মডেল কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ১৯৬৩-৬৪ এবং '৭০ এর মাঝামাঝি কুমিল্লা কোতোয়ালী উপজেলায় গড় ধান উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৯৮ ভাগ। এমনকি এই মডেল চালু করার দু'দশক পরেও কুমিল্লা কোতোয়ালী থানায় গড় ধান উৎপাদন ছিল জাতীয় গড়ের চাইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশী। (সারণী ৪ দেখুন)।

**সারণী-৪**

**কুমিল্লা কোতোয়ালী ও বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র (মণে)**

| বর্ষ | আউশ উৎপাদন | | আমন উৎপাদন | | বোরো উৎপাদন | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | কুমিল্লা কোতোয়ালী | বাংলাদেশ | কুমিল্লা কোতোয়ালী | বাংলাদেশ | কুমিল্লা কোতোয়ালী | বাংলাদেশ |
| ১৯৭৭-৭৮ | ১৮·৫০ | ১০·৮০ | ২০·৯০ | ১৪·১৬ | ২৬·০০ | ২২·৫০ |
| ১৯৭৮-৭৯ | ১৯·৭০ | ১১·১৪ | ২১·৫০ | ১৪·০৯ | ২৬·১০ | ১৯·৮২ |
| ১৯৭৯-৮০ | ১৮·০০ | ১০·২০ | ২০·৪০ | ১৩·৪৬ | ৩২·৩০ | ২৩ ২৭ |
| ১৯৮০-৮১ | ২০·৫০ | ১১·৪৫ | ২৩·৬০ | ১৪·২৯ | ৩০·০০ | ২৪·৫৭ |
| ১৯৮১-৮২ | ১৯·৫০ | ১১·২৬ | ২০·২০ | ১৩·০০ | ৩৪·১০ | ২৬·২৩ |
| ১৯৮২-৮৩ | ১৬·৩০ | ১০·৫২ | ১৯·৮০ | ১৩·৭৫ | ৩৫·৭০ | ২৬·৮২ |

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

কুমিল্লা নিরীক্ষা ললিত পাম্প এবং নলকূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। পূর্ত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ভৌত অবকাঠামো, বিশেষ করে রাস্তা এবং খালের প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

এই মডেলের সমালোচকগণ অবশ্য অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন যে, এই মডেলের অর্থনৈতিক সুবিধাদি অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। একজন সমালোচক বলেছেন যে, পাইলট এলাকায় কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি উচ্চ ভর্তুকীর উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য ঘটেছে; "এটা অব্যবহৃত সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সমবায়ের সহজাত ক্ষমতার" জন্য ঘটেনি।[৩০] সমবায়ের সদস্যগণ অসদস্যদের চাইতে বেশী দক্ষ কিনা এব্যাপারেও মত; বিরোধ রয়েছে। একটি সমীক্ষায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুমিল্লা কোতোয়ালী থানার সমবায় সদস্যগণ অসদস্যদের চাইতে, বেশী ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল।[৩১] যা হোক, বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়নি।[৩২] অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমবায় মালিকানাধীন গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপের সেচ এলাকা অসদস্যদের চাইতে বড়। তবে, অসদস্য দল সমবায় দলের চাইতে অধিকতর দক্ষতার সাথে ললিত পাম্প ব্যবহার করেন।[৩৩]

কুমিল্লা মডেলের দুটি প্রধান ত্রুটি রয়েছে। প্রথমতঃ, আরডব্লিউপি এবং বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের চুয়ানো সুফল ছাড়া ভূমিহীনদের জন্য এই মডেল কোন সরাসরি সাহায্য প্রদান করেনি। তার ফলে এই মডেলের বাস্তবায়ন পল্লী এলাকায় বৈষম্যকে তীব্রতর করেছে। আখতার হামিদ খান বলেছেন যে, "ভালো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, রাস্তা এবং সেচ সুবিধা জমির মূল্য এবং ভাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভূস্বামীদের অনার্জিত আয় বৃদ্ধি ছিল শ্রমিকদের মজুরীর চাইতে শতগুণ বেশী।"[৩৪]

দ্বিতীয়তঃ, ভূমি মালিকানার বিন্যাসের জাতীয় বৈচিত্র্য কুমিল্লা মডেল বিবেচনায় আনেনি। কুমিল্লাতে ছিল বাংলাদেশের সবচে' কম অনুপাতের ভূমিহীন শ্রমিক, সবচে কম অনুপাতের ভাগচাষী, সবচে' বেশী সংখ্যক মালিক চাষী এবং সবচে' কম অনুপাতের বড় চাষী। ক্ষুদে চাষীদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল একটি মডেল বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।[৩৫]

কুমিল্লা মডেলের সম্প্রসারণ অত্যন্ত উচ্চ-হার ভর্তুকি সম্পন্ন উপকরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সুবিধার উপর নির্ভরশীল। কিছু বাছাইকৃত এলাকায় কুমিল্লা মডেলের বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থার সাহায্যে তিনটি বৃহৎ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। সেগুলো হচ্ছে (১) আইডিএ অর্থপুষ্ট আরডি-১ প্রকল্প (মোট বিনিয়োগ ৩৭০ মিলিয়ন টাকা, এলাকা ৭টি উপজেলা, ৭ বছরে উপজেলা পিছু ব্যয় ৫৩ মিলিয়ন টাকা)। (২) এডিবি অর্থপুষ্ট সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (মোট বিনিয়োগ ৭২০ মিলিয়ন টাকা ৪টি উপজেলা,

৮ বছরে প্রতিটি উপজেলায় ব্যয় ১৮০ মিলিয়ন টাকা) এবং (৩) ড্যানিডা অর্থপুষ্ট নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (মোট বিনিয়োগ ২৪০ মিলিয়ন টাকা, ৩টি উপজেলা, পাঁচ বছরে প্রতিটি উপজেলায় ব্যয় ৮০ মিলিয়ন টাকা)।

আরডি-১ প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় যে, কে,এস, এস সদস্যদের অর্থনৈতিক কৃতি সদস্যদের চাইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিন্নতর নয়।[৩৬] সমস্ত এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলোই সমন্বয়ের অভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। তাছাড়া, সমন্বিত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন উপাদান একটা যৌক্তিক ক্রমানুসারে বাস্তবায়িত করা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, সেচের জন্য জল সরবরাহের বহু পূর্বেই ঋণ এবং সার বিতরণ করা হয়েছিল। ডেভিড কর্টন যাকে "নীল-নক্সা পদ্ধতি" বলেন, তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এসব সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-গুলো।[৩৭]

এসব প্রকল্পগুলোকে পরিবর্তনশীল অবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তন করার সুযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে সরকার উচ্চাকাঙ্খী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং শুধুমাত্র তিনটি উপা-দানের মধ্যে পল্লী উন্নয়নের পরিধিকে সীমিত করেছেন ঃ (১) রাস্তা, গুদাম ও বাজার সহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ; (২) সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষি কাজ, ক্ষুদ্র পানি নিষ্কাশন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ; (৩) গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থান কর্মসূচী।[৩৮]

প্রাথমিক সম্ভাবনা সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় তিনটি মৌলিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। প্রথমতঃ, যে ইউসিসিএ—কে,এস,এস পদ্ধতি ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তা' আজ বড় চাষীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিভিন্ন জায়গায় কে,এস,এস অধঃপতিত হয়ে বড় চাষীদের এক-চেটিয়া প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে।[৩৯] ১৯৮০ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, ইউসিসিএ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির কমপক্ষে শতকরা ৪৪ ভাগ সদস্য হচ্ছে বড় কৃষক।[৪০] দ্বিতীয়তঃ, সমবায় সমিতি শৃঙ্খলার (যেমন নিয়মিত যৎসামান্য সঞ্চয়, সাপ্তাহিক হিসাব-নিরীক্ষা) ক্রমোবনতি ঘটেছে। এসব সমিতিতে ঋণ আদায়ের হারও খুব কম। আরডি-১ উপজেলাগুলোতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে, কে,এস,এস-এর সদস্যদের নিকট প্রায় অর্ধেক ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়েছে।[৪১] পরিশেষে, দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় টিকে থাকার জন্য পুরোপুরিভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল। গত দু'দশকে সরকারের উদার পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও অধিকাংশ সমিতি অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

যা হোক, কুমিল্লা মডেলের সহজাত কার্যকারিতার ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে। একজন সমালোচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "সমস্ত কর্মকাণ্ডই হচ্ছে বৈষম্যমূলক অবস্থায় সমবায়ের অর্থহীনতার ব্যাপারে একটি শিক্ষা"।[৪২] এ মডেলের প্রণেতাগণের অভিমত হচ্ছে যে, কুমিল্লা মডেলের ব্যর্থতার জন্য এর

সহজাত কোন ত্রুটিকে দায়ী করা চলে না। বস্তুতঃ, মডেলটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। অতি দ্রুত সমবায় সমিতিগুলোকে সম্প্রসারিত করা হয়। তাছাড়া, কুমিল্লা মডেলের অন্য তিনটি অবিচ্ছেদ্য উপাদানের সাথে সমবায়কে সমন্বিত করা হয়নি। সেচের জল, পানি নিষ্কাশন, এবং অন্যান্য কাঠামো ছাড়া সমবায় বাঁচতে পারে না। পরিশেষে, দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়কে সরকারী সহজ ধরনের কর্মসূচীর (যেখানে কম সুদের হারে ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং যেগুলোতে সমবায় শৃঙ্খলার কড়াকড়ি ছিল না) সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়।[৪৩]

বাংলাদেশে ভূমিহীনতা বৃদ্ধির কারণে পল্লী এলাকার চরম দরিদ্রদের কাছে পৌঁছুবার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে বৃদ্ধি পায়। ভূমিহীনদের সংগঠিত করার জন্য সরকারী এজেন্সী কর্তৃক তিন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় প্রথমতঃ, দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন ভূমিহীন সমিতি (যথা বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং মহিলা সমবায় সমিতি) সংগঠিত করা হয়। যা হোক, এসব সমিতির সাফল্য খুব নগন্য। আরডি-১ প্রকল্পের মূল্যায়নে দেখা যায় যে, ভূমিহীন সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য এক একরের অধিক জমির মালিক, এমনকি এসব সমিতির শতকরা ১৬ ভাগ পরিচালকের বাৎসরিক আয় ৩০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে।[৪৪] কুমিল্লা একাডেমীর প্রকল্প এলাকায় আরেকটি সম্ভাবনাময় নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ভূমিহীনদের একটি আলাদা সমিতিতে সংগঠিত করার বদলে বলরাম-পুর ও কাশিনাথপুর গ্রামে সমস্ত শ্রেণীর মানুষজনের সমন্বয়ে সামগ্রিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এই সমবায় সমিতিটি লিখিতভাবে "দিদার সমবায় সমিতি" নামে পরিচিত। ১৯৬০ সালে এটা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৮২ সালে এর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ মিলিয়ন টাকা। দিদার সমিতি সকল শ্রেণীর সামাজিক সংহতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যা কুমিল্লা মডেলের মৌলিক ধারণার পরিপন্থী। যা হোক, দিদার মডেল অন্যত্র সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়নি। এই সমিতির অস্বাভাবিক সাফল্যের পেছনে যে সকল কারণ কাজ করেছে বলে মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে—স্থানগত সুবিধা (কুমিল্লার শহরতলীতে অবস্থিত), গ্রামে অকৃষিজীবি বাসিন্দাদের আধিক্য (৫৫০ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫০ জন পূর্ণকালীন কৃষিজীবী), কুমিল্লা একাডেমীর উদার পৃষ্ঠপোষকতা এবং এর প্রতিষ্ঠাতার নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা।

সরকারী সেক্টরের কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূমিহীনদের সংগঠিত করার ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প সবচে' উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে। একটা কর্ম গবেষণা কর্মসূচী হিসেবে এর যাত্রা শুরু। এই কর্মসূচীর অনুকল্প ছিল যে, ভূমিহীন লোকজন যাঁরা ঋণের জন্য জামানত প্রদানে অপারগ তাঁদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাংক সুবিধাদি প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ নয়। গ্রামীণ ব্যাংক (জি,বি)

এই ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করা হয় যে, ভূমিহীনদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান দরকার। গ্রামীণ ব্যাংক এবং কুমিল্লা মডেলের মধ্যে দুটো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ গ্রামীণ ব্যাংক সমবায়ের প্রথাসিদ্ধ কাঠামোকে পাশ কাটিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জটিলতা অগ্রাহ্য করে এটা গ্রুপ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয়তঃ, কুমিল্লা মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের একত্রীকরণ এবং বিরামহীন প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক শুধুমাত্র ঋণ সরবরাহের উপর জোর দেয়। উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই একমুখীতা গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকাণ্ডকে সহজতর করে তোলে। এসব ভিন্নতা সত্ত্বেও মূলে দ্বিস্তর বিশিষ্ট কুমিল্লা মডেল এবং গ্রামীণ ব্যাংকের পদ্ধতির মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। দু'টি প্রতিষ্ঠানই সমমনা লোকজনের ছোট ছোট দল সৃষ্টির উপর জোর দেয়। যা হোক, গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের প্রতিটি গ্রুপে নিবিড় তত্ত্বাবধানে ৫ জন করে সদস্য থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের পরীক্ষা নিরীক্ষা আরো দেখিয়েছে যে, বড় দলের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তারা একত্র থাকতে পারে না। একটি গ্রামের সমস্ত গ্রুপ আবার গ্রাম কেন্দ্রে কেন্দ্রীয়ভাবে যুক্ত থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাংক কর্মীরা (বি,ডব্লিউ) গ্রাম কেন্দ্র ও দলসমূহ তত্ত্বাবধান করেন।

এতদ্‌পর্যন্ত জি,বি ঋণ আদায় (৯৬%), গ্রামীণ সঞ্চয় আহরণ (১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ১৯·৪ মিলিয়ন টাকা) এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক উপায়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। এই কর্মসূচীর মূল্যায়ন থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, আড়াই বছরে এই ব্যাংকের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী-দের আয় এই ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের ফলে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ বেড়ে গেছে।[৪৭] প্রত্যাশিত লক্ষ্য দল ভূমিহীন মহিলাদের কাছে পৌঁছুবার ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচী সফল হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের এসব চমৎকার সাফল্য সত্ত্বেও মডেলের কিছু সহজাত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের নেয়া ঐতিহ্যিক খামার বহি-র্ভূত কর্মকাণ্ডের (যেমন ঃ ছোট ব্যবসা, ঐতিহ্যিক কুটির শিল্প এবং গো-পালন এসব খাতে কৃষি ব্যাংকের শতকরা ৮০ ভাগ ঋণ দেয়া হয়েছে) চাহিদাগত বাধা অতিক্রমের জন্য শুধুমাত্র ঋণদানই যথেষ্ট নয়। এসব কর্মকাণ্ডের অতি আধিক্য অতি সরবরাহের কারণ ঘটাতে পারে এবং ভূমিহীন গ্রামীণ দরিদ্রের আয়ের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে, আয় কমে যেতে শুরু করেছে। একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রতিটি ঋণের বৃদ্ধির চাইতে আয় স্বল্পতর হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[৪৮]

দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের নেয়া কর্মকাণ্ডে শ্রমের উৎপাদন-শীলতা খুব কম। উৎপাদনশীল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের তথ্য, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ও সেবা দরকার। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার

বদলে শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রমে ব্যাপৃত। পরিশেষে, এই প্রতিষ্ঠানের বিরামহীন সাফল্যের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের জোর তদারকী। ইতিমধ্যে কিছু প্রতিবেদনদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সাপ্তাহিক সভায় ঋণ গ্রহীতাদের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে।[৪৯] এমত আশংকাও প্রকাশ করা হচ্ছে যে, এর প্রতিভাধর প্রতিষ্ঠাতার অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি টিকে নাও থাকতে পারে।

### ৩। স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক উদ্ভাবন

স্বাধীনতাকালে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রচণ্ড সংকটের সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি, স্বৈরাচারী শাসনের ঘাঁটি স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল। নিম্নতম স্তরের স্থানীয় সরকার "নির্বাচনী কলেজ"-এর ভূমিকা পালন করেছিল এবং স্থানীয় সরকার ছিল "বুনিয়াদী গণতন্ত্রের" সমার্থক। এটা ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের সাংবিধানিক ভণ্ডামির বাহ্যিক রূপ। ফলে স্থানীয় সরকারগুলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাতিল করা হয়। ১৯৭৫ সালে জেলা গভর্ণর পরিকল্পনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। জেলা প্রশাসন আইনে (১৯৭৫-এর ৪র্থ আইন) এটা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল যে, জেলা গভর্ণর নিযুক্ত হবেন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক। সরকারী চাকুরে, সংসদের নির্বাচিত সদস্য বা সরকারী দলের সদস্য হতে গভর্ণর নির্বাচন করা হবে। প্রেসিডেন্ট যতদিন গভর্ণরদের কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন ততদিনই মাত্র তাঁরা তাদের পদে থাকবেন। এই আইনের বলে জেলা গভর্ণরগণ কোন জেলা এলাকায় আদালত ব্যতীত সমস্ত দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করতে পারবেন। এই আইনে অবশ্য তিনটি প্রধান দুর্বলতা ছিল। প্রথমতঃ এই আইন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কোন অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পন করেনি। তার ফলে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অটুট থাকে। দ্বিতীয়তঃ জেলা গভর্ণর পদ্ধতি কোন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটা শুধুমাত্র পেশাগত আমলাদের স্থলে রাজনৈতিক আমলাদের অভিষিক্ত করে। পরিশেষে, জেলা গভর্ণর পদ্ধতি ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকৃত একদলীয় রাষ্ট্রের অস্ত্র। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে এই ধারাটি বাতিল করার জন্য পরবর্তীতে সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়।

যা হোক, জেলা গভর্ণর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। একটি ক্যু এর মাধ্যমে একদলীয় শাসনকে উৎখাত করা হয় এবং নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের নিয়ম পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৭ সালে স্থানীয় সরকারের নিম্নতম স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরও স্থানীয় সরকারের স্ববিরোধিতা বিদ্যমান থাকে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ এই সময়কালে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" সংগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পেছনে তিনটি প্রধান কারণ লক্ষ্যনীয়। প্রথমতঃ

গ্রাম পর্যায়ে কোন প্রশাসন যন্ত্র ছিল না। সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরকারে শাসক গোষ্ঠীর বিরোধী দলের আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। গ্রাম সরকার পরিচালনা করতো কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত সদস্যরা, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তারা তোয়াক্কা করতোনা। পরিশেষে, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে বেকার লোকজনকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে একটি কার্যকর হাতিয়ার বলে ধরা হয়েছিল।

গ্রাম সরকারের থাকতো বার জন সদস্য। মহিলা এবং অন্যান্য পেশা-ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপ—যথা, কৃষক, কারিগর, ভূমিহীন যুবক, এদের যথোচিত প্রতিনিধিত্ব এতে থাকতো। গ্রাম সরকার ছিল পেশাজীবী গ্রুপগুলোর সংঘ। গ্রাম সরকারকে তাদের অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। গ্রাম সরকারকে নির্দেশও দেয়া হয়েছিল গ্রাম পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য এবং এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে স্থানীয় সম্পদ এবং উপকরণ চিহ্নিত করার জন্য। কৃষি উপকরণ ও সহায়ক সেবা প্রদান, সেই সাথে গুদামজাতকরণ ও ব্যাংক সুবিধা প্রদানের জন্য ১২০০টি গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্রের বিষয় দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় বিবেচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থ হবার কারণসমূহ সংক্ষেপে নিম্নোক্ত-রূপে বর্ণনা করা যায় ঃ—

—এটা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এটা নিজে থেকেই গড়ে উঠেনি।
—স্থানীয় সরকারের মূল কাঠামোর সাথে এটা সম্পর্কযুক্ত ছিল না।
—গ্রাম সরকার ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ গ্রাম সরকারের সদস্য হতে পারতেন না, সেহেতু স্থানীয় সরকারের যে সকল রাজনীতিবিদ পরাজিত হয়েছিল তাঁরাই গ্রাম সরকারে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

প্রতিষ্ঠানটিতে অতিরিক্ত পরিমাণে রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৮২ সালের প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি মন্তব্য করে যে, "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয় এবং গ্রাম সরকারের পদাধিকারী ব্যক্তিদের আসীন করার ব্যাপারে শাসক রাজনৈতিক দল অন্যায় হস্তক্ষেপ ঘটায়।"[৫০] একই ভাবে কমিটি অভিযোগ করে যে, "যুব কমপ্লেক্সের মত শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। তাঁদের অভূতপূর্ব ক্ষমতা প্রদান করা হয়—যা বিরাজমান প্রতিষ্ঠানগুলো, এমনকি গ্রাম সরকারগুলোকেও অর্থহীন করে তোলে।"[৫১]

নতুন প্রতিষ্ঠানটি শুধু প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উৎপাদন বিরোধী ছিল। তিনটি সফল গ্রাম

সরকারের অর্থনৈতিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে ঃ

১। প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এসেছে মূলতঃ বৃহৎ ভূমি মালিকদের মধ্য থেকে। যাঁরা ভূমিহীনদের প্রতিনিধিত্ব করতো তাঁদের অনেকেই ছিল বড় ভূস্বামীদের পুত্র যাঁরা এখনো পৈতৃক সম্পত্তি পায়নি বা স্কুল শিক্ষক এবং ব্যবসায়ী। তাঁদের জমিজমা বিশেষ ছিল না, কিন্তু আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। জরিপ এলাকার গ্রামগুলোতে গড় ভূমি মালিকানা ছিল ১'৫ থেকে ২'৫ একর, অন্যদিকে গ্রাম সরকারের নেতৃবৃন্দের গড় ভূমি মালিকানা ছিল ৮ একর।

২। দু'টি প্রণিধানযোগ্য বিষয়ে এই আন্দোলন ছিল অত্যন্ত দুর্বল ঃ জনগণের অংশগ্রহণের স্তর বিচারে এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণের কার্যকারিতার বিচারে। আন্দোলনটি বহুল পরিমানে নির্ভরশীল ছিল সরকারী সাহায্য ও উদ্যোগের উপর।

৩। পল্লী এলাকায় স্বনির্ভর প্রকল্প অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ত্বরান্বিত করে। এসব প্রকল্পগুলো ছিল শ্রমনির্ভর। প্রকল্পগুলোতে যাঁরা শ্রম দিত তাঁরা ছিল মূলতঃ ভূমিহীন। তাঁরা এসব রাস্তা, খাল এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা থেকে লাভবান হয় না। বড় জোর স্বনির্ভর প্রকল্প (সেচ, জল নিষ্কাশন, রাস্তা ইত্যাদি) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বা কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণে সহায়ক হয়। এসব প্রকল্পের সুফল ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে বর্তায়। পুনর্বন্টন পদ্ধতির অভাবে স্বনির্ভর প্রকল্পের বিষয়ে দরিদ্রের উৎসাহ উদ্দীপনাকে ধরে রাখা যায়নি।

স্থানীয় সরকারের বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টির পরীক্ষা নিরীক্ষা একের পর এক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৮২ সালে সরকার প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি স্থানীয় সরকারকে জোরদার করার জন্য জোর সুপারিশ রাখে। এই কমিটির মতে "স্থানীয় সরকারগুলোকে সত্যিকারভাবে স্বনির্ভর প্রাণবান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং পারস্পরিক ও পরিপূরক উন্নয়নের জন্য তাঁদের মধ্যে যথার্থ সমান্তরাল ও উল্লম্ব যোগাযোগই হবে মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে যে, পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী বা সমাজতান্ত্রিক যে কোন সমাজেই পল্লী এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তথ্যগত প্রমাণ রয়েছে যে, যে সব দেশ স্থানীয় সরকারের ব্যবহার ঘটায়নি তাদের চাইতে যারা পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারের ব্যবহার ঘটিয়েছে তারা উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় লাভে সক্ষম হয়েছে এবং প্রথমোক্ত দেশগুলো এখনো স্থবির পর্যায়ে থেকে গেছে।"[৫৩] এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যে উপজেলা পদ্ধতির সূচনা করা হয় তা' মূলতঃ কুমিল্লা মডেলের একটি সম্প্রসারণ। থানাই হওয়া উচিত সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র, এ ধারণার উপরই গড়ে উঠে উপজেলা পদ্ধতি। কুমিল্লা মডেলের মৌলিক তত্ত্বই ছিল তাই। পরবর্তী অনেক গবেষণাতেও থানা পর্যায়ে সমন্বয়ের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।[৫৪] কুমিল্লা মডেলে এটাও ধরে নেয়া হয় যে, শুধুমাত্র স্থানীয় সম্পদ আহরণের

মাধ্যমে গ্রামীণ সমস্যা সমাধান করা যাবেনা এবং কেন্দ্র থেকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-গুলোতে পর্যাপ্ত সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। যা হোক, কুমিল্লা মডেলের থানা কাউন্সিল থেকে উপজেলা পরিষদের চারটি পার্থক্য রয়েছে ঃ (ক) থানা কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন একজন সরকারী কর্মকর্তা (এসডিও), অন্যদিকে উপজেলা পরিষদের রয়েছে সরাসরি নির্বাচিত চেয়ারম্যান। (খ) থানা কাউন্সিলের রাজস্ব আদায়ের কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু উপজেলা পরিষদকে করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (গ) পৌরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি) উপর থানা কাউন্সিলের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর ২৫ নং ধারা বলে উপজেলা পরিষদকে তার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় সমস্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (ঘ) উপজেলা পরিষদের গঠনও থানা কাউন্সিল হতে ভিন্নতর। উপজেলা পরিষদে রয়েছে একজন সরাসরি নির্বাচিত চেয়ারম্যান, উপজেলাস্থ সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান, তিনজন মনোনীত মহিলা সদস্য, সরকার মনোনীত সরকারী কর্মকর্তা, একজন মনোনীত সদস্য এবং ইউসিসিএ'র চেয়ারম্যান এর সদস্য। সরকারী সদস্যদেরকে ভোট প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

এই নতুন পদ্ধতির মধ্যে পরিসংক্রমের কিছু উপাদানও রয়েছে। উপজেলা পরিষদকে করারোপ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সুস্পষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করে একে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। একটি সরকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জাতীয় সরকার ও উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে সরকার যে সব কার্যাবলী সম্পন্ন করতেন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ঃ হস্তান্তরিত কার্যাবলী ও সংরক্ষিত কার্যাবলী। জাতীয় সরকারের কার্যাবলী ১৭টি বিষয়ের বিশদ তালিকার মধ্যে সীমিত রাখা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা, বড় বড় স্কীম, খাল খনন, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন। ধরে নেয়া হয় যে, সরকার যে সব বিষয়াদি সংরক্ষণ করেননি তা উপজেলা পরিষদের আওতাধীন। যদিও সরকারীভাবে দাবী করা হয় যে, পরিসংক্রম হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য, তবু উপজেলা পরিষদ সরকারের একটি অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিদ্যমান। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ২৬ নং ধারা বলে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত যে কোন ইনস্টিটিউশন বা এর ব্যবস্থাপনার আওতাধীন যে কোন সেবামূলক কার্যক্রমকে সরকার গ্রহণ করতে পারে বা তার উল্টোটিও করার ক্ষমতা রাখে। উপজেলা পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করার প্রভূত ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা, বাজেট অনুমোদন, কর অনুমোদন, সাধারণ তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ, কোন কার্যবিবরণী

রদ বা পরিষদের কোন প্রস্তাবের বাস্তবায়ন স্থগিতকরণ এবং নির্বাচিত পরিষদ বাতিলকরণ। এতদ্‌পর্যন্ত উপজেলা পরিষদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে খুব বেশী পরিমাণ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করা থেকে সরকার মোটামুটিভাবে বিরত থেকেছে। যা হোক, সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত প্রভূত ক্ষমতা উপজেলা পরিষদের উপর ডেমোক্লেসের খড়্গের মত ঝুলছে। উপজেলা পরিষদের দুর্বলতম বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামো। যদিও পরিষদকে ট্যাক্স এবং লেভি সংগ্রহ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তবু উপজেলা পরিষদের জন্য নির্ধারিত রাজস্বের উৎস সম্ভাবনার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়।[৫৫] এ আয় দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার খরচের জন্যও যথেষ্ট নয়। তার ফলে উপজেলা পরিষদ তার অস্তিত্বের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অতি পরিমাণে নির্ভরশীল। এটাই তাদের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে। জাতীয় সরকার এবং উপজেলা পরিষদের মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগির কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেই। সত্যিকার অর্থে উপজেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদার নয়, অর্থনৈতিকভাবে এবং আইন-গতভাবে তার ক্রীড়নক মাত্র।

যা হোক উপজেলা পরিষদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি। চিমা এবং রণ্ডিনেলী যথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, "বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পেতে হলে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।"[৫৬] এমনকি এই সংক্ষিপ্ত সময়েও উপজেলা পরিষদের নিম্নলিখিত সাফল্যগুলো সহজেই চিহ্নিত করা যায় ঃ

(ক) পল্লী এলাকায় সরকারী ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় সরকার ভৌত অবকাঠামোর জন্য ৫২৫৩ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে। উন্নয়ন কাজের জন্য গ্র্যান্ট-ইন-এইড হিসেবে ৩৭০৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৫০৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ৮·৪৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য প্রদান করেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে উপজেলা পরিষদকে পাবলিক সেক্টরে বরাদ্দের শতকরা প্রায় ৬·৭ ভাগ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-১৯৯০) পাবলিক সেক্টরের পরিকল্পিত বরাদ্দের (টাকা ২২৫০০ মিলিয়ন) শতকরা ৯ ভাগ উপজেলার উন্নয়ন সাহায্য এবং অবকাঠামোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

(খ) উপজেলায় একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। হস্তান্তরিত বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতীয় কর্মকর্তাদের চাকুরী প্রেষণে উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

(গ) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বিশেষতঃ বিচার ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকৃত করা হয়েছে এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পদ্ধতির অবশ্য কিছু কিছু সহজাত ঝুঁকি ও দুর্বলতা রয়েছে। এদের কোন কোনটা সাময়িক সমস্যা, অন্যান্যগুলো কাঠামোগত ত্রুটি। প্রথমতঃ একটি উপজেলা পরিষদের এলাকায় গড় জনসংখ্যা হচ্ছে ০·২ মিলিয়নের অধিক। পল্লীর দারিদ্রের কার্যকর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উপজেলা খুবই বিপুলায়তন প্রতিষ্ঠান। উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকারগুলোতে সাধারণতঃ আধিপত্য করে গ্রামীণ এলিটবর্গ।

"পূর্বকালে এ ধরনের গ্রামীণ এলিটবর্গকে প্রায়শঃই সমাজসেবী হিসেবে দেখা যেতো, বর্তমানে অধিকাংশ সময় তাদেরকে শোষক হিসেবে দেখা হয়।"[৫৭] ১৯৭৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক জরিপে দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের শতকরা ৬০ ভাগ নেতৃবৃন্দ ৭·৫ একরের চাইতে বেশী জমির মালিক, যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ কৃষক ২·৫ একরের কম জমির মালিক। তদন্তে আরো দেখা গেছে যে, পরিষদের পদে আসীন হবার পর তাদের অর্ধেক সদস্য অতিরিক্ত জমির মালিক হয়েছে।[৫৮] সুতরাং এটা ধরে নেয়া যায় যে, স্থানীয় সরকারকে জোরদার করলে গ্রামীণ এলিটবর্গের শোষণ করার ক্ষমতা বাড়বে বই কমবে না।

দ্বিতীয়তঃ উপজেলা পরিষদ গৃহীত অধিকাংশ প্রকল্প পল্লী এলাকায় বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। উপজেলা পরিষদের পুরো বরাদ্দের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় হয় ভৌত সুবিধা, বিজ্ঞান, কৃষি, সেচ, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রকল্পে। এসব প্রকল্প গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে সরাসরি লাভবান করবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে আইয়ুব আমলে (১৯৫৮-৬৯) একই ধরনের প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী চাষীদের ছোট্ট দল এসব প্রকল্পের সুফল লুটে নেয়।[৫৯] তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদ হচ্ছে ঝঞ্ঝাসংকুল আমলাতান্ত্রিক সমুদ্রে একটি গণতন্ত্রের দ্বীপ। উপজেলা এবং পরবর্তী উচ্চতর জেলার মধ্যকার সম্পর্ক এখনো নির্ধারিত হয়নি। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া বিভিন্ন অবাস্তব আইন-কানুন প্রয়োগের মাধ্যমে উপজেলাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থ বরাদ্দের বিরাজমান নিয়ম উপজেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ভিন্নতাকে বিবেচনায়ই আনেনা।[৬০] চতুর্থতঃ উপজেলা পরিষদ হচ্ছে একটি বিভক্ত শিবির। এর পরতে পরতে দ্বন্দ্ব—আমলা ও রাজনীতিবিদের দ্বন্দ্ব, আমলাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং রাজনীতিবিদদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব।[৬১] উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এক সাথে অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে উপজেলা পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কোন আনুগত্যের দায় নেই। আমলাগণ রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করে না, রাজনীতিবিদরাও উল্টো আমলাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মনোভাব গড়ে তোলে। উপজেলা পর্যায়ে আমলাগণও দায়িত্বগত ও এলাকাগত বিরোধ, সাধারণ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ বিরোধ এবং ক্যাডারে ক্যাডারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, ১৯৮৪ অর্থ বছরে

উপজেলা পরিষদসমূহ ছাড়কৃত অর্থের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগও ব্যয় করতে পারেনি।

উপজেলা পরিষদকে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউশন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিক ভাবে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সবচে' বড় বাধাকে বি সি স্মিথ "রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব" বলে অভিহিত করেছেন।[৬২] এসব ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন কেন্দ্রের শাসক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। ফলে জাতীয় পর্যায়ে যখন ক্ষমতার হাত বদল হয় তখন বৈধতার সংকট দেখা দেয়। বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে সঠিক জাতীয় মতৈক্য থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কোন ক্রমেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচনের সময়কাল ও পদ্ধতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এখনো নিশ্চিত নয়, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপজেলা নির্বাচন বর্জন কোন বৈধতার সংকটের জন্ম দেবে কিনা ; সেক্ষেত্রে এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। স্বল্পকালীন সুবিধার জন্য উপজেলা পরিষদকে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে গ্রহণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের সরকারী কর্মসূচী ছিল স্থায়ীত্বহীন। যথেষ্ট সময় এবং দিক নির্দেশনার নিরবচ্ছিন্নতা ছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়।

## ৪। বাংলাদেশের এন,জি,ও কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহ

সরকারী এজেন্সী কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি গত দু'দশকে বাংলাদেশে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এন,জি,ও) কর্তৃক পরিচালিত বেশ কিছু সংখ্যক উদ্ভাবনী কর্মসূচী লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিকভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সর্বদাই গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে এন,জি,ওদের সংখ্যার ত্বরিত বৃদ্ধি ঘটে। বর্তমানে সরকারের নিকট রেজিস্ট্রীকৃত ৮,০০০ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের অধিকাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। প্রায় ২০০ শত প্রতিষ্ঠান বিদেশী উৎস থেকে সাহায্য পায়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিকালে এন, জি, ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তির বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ শিল্পোন্নত দেশের এন,জি,ওগুলোর আয় যথেষ্ট। ১৯৮৩ সালে তারা প্রায় ৩·৬ বিলিয়ন ডলার রেয়াতী সাহায্য দিয়েছে যা প্রায় শিল্পোন্নত দেশের মোট প্রদত্ত সাহায্যের শতকরা ১০ ভাগ।[৬৩] এন,জি,ওদের তহবিলের প্রায় তিনের দু'ভাগ আসে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত থেকে এবং বাকীটা আসে সরকারী খাত হতে। অফিসিয়াল ডেভেলপম্যান্ট এ্যাসিস্টেন্স (ও,ডি,এ)-এর প্রায় শতকরা চার ভাগ দেয়া হয়েছে এন,জি,ওদের মাধ্যমে। ১৯৮৪-৮৫ সালে শুধুমাত্র বাংলাদেশই এন,জি,ওদের মাধ্যমে পেয়েছে প্রায় ৮০·৪ মিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয়তঃ বাংলা-

দেশে দারিদ্রের ব্যাপকতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ বিরাট সংখ্যক এন,জি,ওকে বাংলাদেশে আকৃষ্ট করে।

বাংলাদেশের এন,জি,ওগুলোকে ৫টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ দাতা সংস্থা—যারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এন,জি,ওকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য তহবিল দিয়ে থাকে। এসব সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, অক্সফাম, নভিব, কিউসো ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক এন,জি,ও—যারা বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। কেয়ার, এস,ই,এফ, আর, ডি,আর, এস, হীড, এম,সি,সি ইত্যাদি এই ভাগে পড়ে। তৃতীয়তঃ দেশীয় এন, জি,ও-যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সংগঠিত করছে। প্রধান প্রধান দেশীয় এন,জি,ওগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন কমিটি (ব্র্যাক), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জি,কে), প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিকা কুমিল্লা, নিজেরা করি, কারিটাস ইত্যাদি। চতুর্থতঃ বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় কর্মকাণ্ডের এন,জি,ও রয়েছে যারা স্বল্প এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। পরিশেষে, কতগুলো সেবামূলক এন,জি,ও রয়েছে যারা অন্যান্য এন,জি,ওকে কারিগরী সহায়তা ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমিতি (এডাব), স্বেচ্ছামূলক স্বাস্থ্য সেবা সমিতি (ভিএইচএসএস) ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সমিতি সমূহ (মাইডাস) এই ভাগে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে দেশীয় এন,জি,ওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক সবচে' বেশী পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শরণার্থীদের সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ হিসেবে ১৯৭২ সালে ব্র্যাক সাহায্য বিতরণী প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্র্যাকের কর্মপদ্ধতির পেছনে যে চিন্তা-চেতনা কাজ করে তা হচ্ছে, গ্রামীণ দরিদ্ররা কখনোই তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না যদি না তাঁরা গ্রামীণ এলিটবর্গকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য ভারসাম্য আনয়নকারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সেজন্যে ব্র্যাক ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদেরকে শক্তিশালী গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উৎসাহ প্রদান করে। ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, ভূমি মালিক ও ভূমিহীনদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্য সমস্ত গ্রামবাসীকে একই প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত করা অর্থহীন। ব্র্যাকের গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান (ভিও) ভূমি-হীনদের কয়েকটি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়, যারা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) ব্র্যাক বিশ্বাস করে যে, চেতনার উন্নয়ন ব্যতীত ভূমিহীনদের কার্যকর উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্যে সচেতনায়নের উপর জোর দেয়।[৬৫] অক্ষর জ্ঞান প্রদানের জন্য এবং সেই সাথে ভূমিহীনদের মধ্যে দারিদ্রের উৎস এবং সংঘবদ্ধ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তারা একটি ব্যবহারিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে। ব্র্যাক তার সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও প্রশিক্ষণ প্রদান করে যা গ্রামীণ ব্যাংক করে না।

(গ) ব্র্যাক তার কার্যক্রম কোন পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করেনি। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্র্যাকের কার্যক্রম রূপলাভ করেছে। বর্তমানে ব্র্যাক তিন ধরনের কর্মসূচী পরিচালনা করেঃ সচেতনায়নের জন্য আউটরিচ কর্মসূচী, গ্রামীণ ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প এবং কিছু কিছু নির্বাচিত এলাকার জন্য সমন্বিত কর্মসূচী। এসব প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে কার্যকর ভূমিহীন দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের কৌশলকে তিনটি পর্যায়ে চিহ্নিত করা যায়।[৬৬] প্রথম পর্যায়ে সমস্ত নতুন দল দু'বছর পর্যন্ত সচেতনায়নের প্রশিক্ষণ পায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত তৈরীতে সাহায্য করার জন্য দলকে দু'থেকে পাঁচ বছর কাল ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। শেষ পর্যায়ে থাকে স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ ৬-৭ বছরের সমন্বিত কর্মসূচী। এ পর্যায়ে ব্র্যাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের সামর্থ এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সৃষ্টির জন্য সাহায্য সহযোগিতা এবং সেবা প্রদান। ধরে নেয়া হয় যে, একটি সমন্বিত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর দরিদ্রগণ নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারবে এবং ব্র্যাকের লোকজন সেখান থেকে তাদের কর্মকাণ্ড গুটিয়ে ফেলতে পারবে।

(ঘ) ব্র্যাক ঋণের ব্যাপারেও কড়াকড়ি নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখার উপর জোর দেয়। যে সব দল ঋণ পায় তাদের উপর নিম্নবর্ণিত কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়ঃ দলের সদস্যদের নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সভায় যোগ-দান বাধ্যতামূলক এবং তাঁদেরকে একটি সঞ্চয় তহবিলে কমপক্ষে এক টাকা জমা দিতে হয়। সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ব্যবহারিক শিক্ষা কোর্সে অংশ গ্রহণ করতে হয়। যৌথ সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে দলকে সক্ষম-তার প্রমাণ দিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ঋণের শতকরা দশভাগ দলের লোকদের নিজেদেরকেই জোগাড় করতে হয়। গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্বাস করে যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য ছোট ছোট দল আবশ্যক; ব্র্যাক তা করে না। সাধারণতঃ একটি গ্রামে দু'টো দল থাকে, পুরুষদের জন্য একটা আর মহিলাদের জন্য আরেকটা। ব্র্যাক দলীয় সদস্যদের যৌথ কর্মকাণ্ডের উপরও জোর দিয়ে থাকে।

(ঙ) প্যারামেডিকদের সাহায্যে ব্র্যাক নতুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সূচনা করেছে। প্যারামেডিকগণ ১৮ থেকে ২০ ধরনের সাধারণ রোগের চিকিৎসা করে, টিকা দেয় এবং গ্রামবাসীদের পরিবার পরিকল্পনা ও প্রতিষেধক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দু'ধরনের। প্রথমতঃ এটা গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য উন্নততর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ এটা ব্র্যাকের প্যারামেডিকদের খণ্ডকালীন কর্মের সংস্থান করে।

কিছু কিছু এলাকায় (১৫০০ গ্রামের ৮০,০০০ হাজার সদস্যের ১৭০০ গ্রুপ) গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে সংগঠিত করার ব্যাপারে সফল হলেও ব্র্যাকের দু'টি প্রধান সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমতঃ ব্র্যাক তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

বাইরের সাহায্য-সহায়তার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ ব্র্যাকের কর্ম-পদ্ধতি খুবই দীর্ঘ মেয়াদী এবং এর সম্প্রসারণ অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

ব্র্যাকের সচেতনায়ন কর্মসূচী অন্যান্য জাতীয় কার্যক্রমের এন,জি,ও কর্তৃক উন্নততর করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রশিকা নামে অন্য একটি এন,জি,ও "মানবিক উন্নয়ন"-এর উপর জোর দিয়ে থাকে; তাদের কার্যক্রম দরিদ্র ও অত্যাচারিতদেরকে বিরাজমান সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আস্তে আস্তে সচেতন করে তোলে। প্রশিকা জনপ্রিয় থিয়েটারের একটি বিশেষ কর্মসূচীও চালু করেছে যা সাধারণতঃ অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কোন বিষয় বা ঘটনাকে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক কর্ম গবেষণায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এন,জি,ওগুলো।[৬৭] এন,জি,ওগুলোর প্রধান প্রধান অবদানকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

—এন,জি,ওদের লক্ষ্যদল কেন্দ্রিক কর্মপন্থা সমরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন দরিদ্রদের ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনমুখী ইউনিটে সংগঠিত করার ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছে। এসব দল রাজনৈতিকভাবে সচেতন। বিরাজমান গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর দ্বারা সহজে তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

—বাংলাদেশে এন,জি,ওরা দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশের দরিদ্ররা ঋণ পাবার যোগ্য। দরিদ্রদের ঋণ পরিশোধের হার খুব উঁচু এবং তারা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার প্রচলিত হারেই সম্মত থাকে। এর ফলে দরিদ্রদের জন্য ব্যাংক সুবিধা প্রদান একটি বাস্তবধর্মী প্রস্তাব হয়ে উঠেছে। সফল এন,জি,ওগুলো দেখিয়েছে যে, দরিদ্ররা সঞ্চয়ও করতে পারে। যা হোক, গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দলীয় চাপ প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

—এন,জি,ওরা দেখিয়েছে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য ঋণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়। যেটার বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। দরিদ্ররা নিজেদেরকে যে দৃষ্টিতে দেখে এবং বিশ্ব সম্পর্কে তারা যে ধারণা পোষণ করে তার পরিবর্তন দরকার। আশাহত দরিদ্রদেরকে এই ধারণা দেয়া উচিত যে, পৃথিবীটা অন্য রকম হতে পারে এবং বিকল্প পথও রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে সচেতনায়ন বা চেতনার উন্নয়ন বলা হয়। বাংলাদেশে এন,জি,ওগুলো সচেতনায়নের সম্ভাবনাকে মূর্ত করেছে।

—বাংলাদেশের কিছু কিছু এন,জি,ও গ্রামীণ দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য জনপ্রিয় লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। আর,ডি,আর,এস-এর তৈরী পা-চালিত পাম্প এম,সি,সি-র তৈরী শক্তিচালিত পাম্প এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এন,জি,ওগুলো লাগসই মডেল সৃষ্টিতেও সাফল্য অর্জন করেছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড এবং ব্র্যাকের ওরাল ডিহাইড্রেশন থেরাপীর অংশ ওরাল থেরাপী সম্প্রসারণ কর্মসূচী বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

—এন,জি,ওরা সরকারী এজেন্সী হতে অধিকতর উদ্ভাবনী সম্ভাবনাসম্পন্ন। এন,জি,ওরা কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর নমনীয়। সরকারী এজেন্সীর এই সুবিধাটি নেই। তাদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পিত পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় না। "ঐতিহ্যিক প্রকল্প হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত এবং কাঠামোকেন্দ্রিক; অপরদিকে এন,জি,ও কর্মসূচীগুলো অধিকতর হারে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পিত এবং কার্যকালে পরিবর্তনযোগ্য।"[৬৮] ফলে সরকারী এজেন্সী কর্তৃক অন্যত্র বাস্তবায়নযোগ্য ক্ষুদ্র পাইলট সরবরাহ পদ্ধতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এন,জি,ওরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

—পল্লী উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টিতে এন,জি,ওরা সহায়তা প্রদান করতে পারে। কিছু কিছু এন,জি,ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্রদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

—এন,জি,ওদের প্রচারস্বল্পতা তাঁদেরকে রাজনৈতিক লড়াই ও আইনগত সংকট থেকে মুক্ত রাখে; প্রায়শঃই এই বাধাসমূহ সরকারী কর্মসূচীকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

এন,জি,ওদের অবশ্য কতগুলো সহজাত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমতঃ প্রায় সব এন,জি,ওই বহির্দেশীয় সাহায্যের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এন,জি,ওদের লাগামহীন কর্মতৎপরতা একটি দেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের জন্য প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এন,জি ওরা অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি করে। ফলে এন,জি,ও ও সরকারের মধ্যে বিপজ্জনক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে। তৃতীয়তঃ প্রায়শঃই এন,জি,ওরা সরকারী কর্মসূচীর কার্যকারিতা বিনষ্ট করে এবং তাকে ধ্বংস করে। উচ্চতর বেতন ভাতা ও অধিকতর সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে এন,জি,ওগুলো অধিকতর দক্ষ মানুষজনকে আকৃষ্ট করে। সরকারী কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত বেতন পায় এবং ফলে এন,জি,ও কর্মী ও সরকারী কর্মীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর বৈরীতা দেখা দেয়। চতুর্থতঃ স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এন,জি,ওগুলোকে শুধুমাত্র তাঁদের নিজেদের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়। জনগণের কাছে জবাবদিহি করার কোন পদ্ধতি তাতে নেই। সকল এন,জি,ওই সমভাবে সফল নয়। এন,জি,ওর স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, তারা পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেয় এবং প্রকৃতিগত কারণেই তারা সর্বক্ষেত্রে সফল হতে পারে না। পঞ্চমতঃ বাংলাদেশে কিছু কিছু এন,জি,ওদের মধ্যে দলাদলি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। এন,জি,ওদের মধ্যে এ ধরনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে।[৬৯] পরিশেষে বলা যায়, যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পে এন,জি,ওরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে তবু তাঁদের পক্ষে সারা দেশে তা সম্প্রসারিত করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। এন,জি,ওদের রাজনৈতিক সমর্থন এবং আইনগত সিদ্ধতার ঘাটতি রয়েছে। ফলে বড় প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সফল নাও হতে পারে।

এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে এন,জি,ওদের ভূমিকা পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হয়নি। আইনগতভাবে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান (নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ (অধ্যাদেশ নং ৪৬, ১৯৬১) দ্বারা পরিচালিত। এই অধ্যাদেশের ধারা মতে নিবন্ধীকরণ ছাড়া কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায় না। যে কোন লোক যদি এই অধ্যাদেশকে ভংগ করে তবে তাকে জেল প্রদান বা জরিমানা করা যেতে পারে। বাইরের সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরো কড়াকড়ি আরোপ করা হয় বিদেশী সাহায্য (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) প্রবিধান অধ্যাদেশ ১৯৭৮-এর মাধ্যমে। এসব আইনের মাধ্যমে এন,জি,ওগুলোকে কয়েকটি সরকারী এজেন্সী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় (যেমন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)। এন,জি,ওরা অভিযোগ তোলেন যে, সরকার নির্ধারিত আইনগত নিষেধাজ্ঞা তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। সমস্যাটা শুধুমাত্র আইনগতই নয়। সরকারের উচিত এন,জি,ওদের ভূমিকাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। সরকার স্বীকৃত ভূমিকার উপরই নির্ভর করবে এন,জি,ওদের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা এবং তাদের স্বায়ত্ত-শাসনের পরিমাণ। সরকার এন,জি,ওদের নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যবহার করতে পারে ঃ

—সম্পূরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ;
—প্রতিপূরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ;
—উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনার প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

বলা হয়ে থাকে যে, গ্রামীণ দারিদ্রের সমস্যা এত ব্যাপক এবং এত জটিল যে, এক্ষেত্রে এককভাবে সরকারী প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনের জন্য সরকারী কর্মসূচীর সম্পূরক হিসেবে এন,জি,ওরা কাজ করতে পারে। এটাই যদি এন,জি,ওর উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত হয় তবে এন,জি,ওদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ সরকার এন,জি,ও-দেরকে প্রতিপূরক এজেন্সী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে; তারা সরকারী কর্মসূচীর বিরাজমান ফাঁকগুলো পূরণ করবে। অথবা এন,জি,ওদেরকে সরকারী কর্মসূচীর অংশ বিশেষ বাস্তবায়নের দায়িত্বও প্রদান করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আরডি-২ প্রকল্পে গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে কয়েকটি এন,জি,ওকে। এন,জি,ওদের যদি সরকারী কাজের প্রতিপূরক হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে এন,জি,ওদেরকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যাহোক, এন,জি,ওদের প্রধান শক্তি হচ্ছে উদ্ভাবনী কার্যক্রমগ্রহণে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের চিন্তা ভাবনা ও বাস্তবায়নে জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যথাযোগ্য নয়। সরকার যদি চান এন,জি,ওরা সফল হোক তাহলে তাদেরকে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে হবে।

## ৫। বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত প্রণিধানযোগ্য বিষয়াদি

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নাটকীয় ঘটনা-বলী প্রত্যক্ষ করা গেছে। যা হোক, এসব নাটকের পাত্রপাত্রী কিন্তু গ্রামীণ দরিদ্রর।

নয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তাঁরা ইতিহাসে সম্পর্কশূন্য অবস্থায় ধুকে ধুকে মরছে। একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, "- - - - বাইরের এজেন্সী, এমন কি সরকারের উচিত নয় এটা ভাবা যে, তারা উন্নয়ন সাধন করছেন। দুর্ভাগ্যজনক-ভাবে আজকে আমরা দেখছি যে, জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রশাসন পরিচালনা করা হচ্ছে। নীতি নির্ধারক, আমলা এবং প্রযুক্তিবিদ নিজেরা বৈদেশিক দাতা সংস্থার সাথে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য মঙ্গলকর কাজ কোনটি। তাঁরা এরপর গ্রামীণ জনগনের উপর তা চাপিয়ে দেয়। এধরণের সুচিন্তিতভাবে প্রণীত সমন্বিত কার্যক্রম গ্রামীণ লোকজনের বোধগম্য হয় না। এগুলো তাদের স্বকীয় সৃষ্টিশীলতাকে রুদ্ধ করে দেয় ও নিষ্ক্রিয়তা ও নির্ভরশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে।"[১০]

উৎপাদনকেন্দ্রিক উন্নয়ন থেকে গণকেন্দ্রিক উন্নয়নে উত্তরণ শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবেই কাম্য নয়, অর্থনৈতিকভাবেও আবশ্যকীয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায় যদি প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে এবং তাতে থাকে স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ।"[১১] তাত্ত্বিক দিক থেকে বিকেন্দ্রীকরণের সুফলকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়।[১২]

—কেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের চাইতে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন অধিকতর কার্যকর ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ।

—সমস্ত সামাজিক দলগুলোর অধিকতর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে বিকেন্দ্রী-করণ সরকারী সম্পদের অধিকতর সুষম বরাদ্দের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

—পরিকল্পনাবিদ ও সুবিধাভোগীদের মধ্যে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনাকে আরো বাস্তবধর্মী করে তোলে।

—ঐতিহ্যিক প্রশাসনের চাইতে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন প্রায়শঃই অনেক বেশী নমনীয়, উদ্ভাবনী সম্ভাবনাসম্পন্ন এবং সৃষ্টিশীল।

—বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় কর্মকর্তা ও নেতৃবর্গের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে জোরদার করে।

—এটা লাল ফিতার দৌরাত্মকে কমাতে পারে এবং আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির জটিলতাকে কাটিয়ে তুলতে পারে।

—এটা বিকেন্দ্রীকৃত কর্মকাণ্ডের রাজনৈতিক বৈধতা প্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় আমলাদেরকে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ও সংবেদনশীল করে জাতীয় সরকারকে জোরদার করে তুলতে পারে।

—এটা জনগণের অংশ গ্রহণকে বৃদ্ধি করতে পারে, পরিণামে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী এজেন্সীগুলোর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।

—বিকেন্দ্রীকরণ সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও সেবার ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের অধিকার বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সরকারী সেবা বিতরণ অধিকতর কার্যকর হয়ে উঠে।

যা হোক, উন্নয়নশীল দেশে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সহজ নয়। কিছু কিছু তাত্ত্বিক অভিমত পোষণ করেন যে, বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ন্যূনতম উন্নীত অর্থনৈতিক পর্যায় প্রয়োজন। অন্যদের বক্তব্য হচ্ছে যে, বিকেন্দ্রীকরণ নিজেই তার সাফল্যের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। সফল বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, এসব কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভর করে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির ক্ষমতার উপর। এগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা চলে।

—রাজনৈতিক অবস্থা ;
—প্রশাসনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা ;
—সম্পদের অবস্থা।

রাজনৈতিক ভাবে সবচে' প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে মতাদর্শ। বিকেন্দ্রীকরণকে লক্ষ্যার্জনের একটি উপায় হিসাবে দেখা যেতে পারে ; একে শুধুমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করলে এর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দুর্বল হয়ে পড়ে। মৌলিক মানবিক প্রয়োজনে বিকেন্দ্রীকরণকে রাজনৈতিক অভীপ্সার লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জেফারসন জোর দিয়ে বলেছেন যে, কার্থেজ যতদিন অস্তিত্ববান ছিল ততদিন যেমন রোম নিরাপদ ছিল না, তেমনি, "ছোট ছোট রিপাবলিকগুলো"কে স্থানীয় পর্যায়ে সমৃদ্ধ হতে না দিলে রিপাবলিক নিজেই নিরাপদ নয়।[৭৩]

দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের প্রায় সব বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীই উপর থেকে সূচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকগণ স্থানীয় সমর্থন লাভের জন্য এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে জোরদার করার জন্য স্থানীয় সরকারের সৃষ্টি করেছিল। ফলে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কোন মতাদর্শগত প্রতিশ্রুতি নেই। পরিণামে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে পারস্পর্য নেই। অতি দ্রুত নীতির বদল ঘটেছে এবং উপরে অবস্থিত কর্তৃত্বশীল শাসনের রাজনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টির জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি সরকার বদলের সময় এধরণের রাজনীতিকায়ণ বৈধতার সংকটের জন্ম দিয়েছে। গত দু'দশকে মৌলিক গণতন্ত্র, জেলা গভর্ণর স্কীম এবং স্বনির্ভর গ্রাম সরকার অতি দ্রুত পরিত্যক্ত হয়েছে। বাইরের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে না পারলে উপজেলা পদ্ধতিকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে।

গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিকেন্দ্রীকরণ একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। রাজকৃষ্ণ যথার্থই নির্দেশ করেছেন, "এলাকা স্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক সকল প্রতিষ্ঠানে এলিটবর্গের আধিপত্য একটা সর্বগ্রাসী বাস্তবতা। এসব প্রতিষ্ঠানে কদাচিৎ দরিদ্রদের স্বার্থ ঠাঁই পায়। অনেক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের নৈমিত্তিক ফলাফল হচ্ছে উন্নয়নী আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিবাজ অংশের যোগসাজসে

আধিপত্যকারী গ্রামীণ এলিটবর্গ কর্তৃক সম্পদের এবং প্রকল্পের সুবিধা আত্মসাৎ। এমনকি যখন প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সীমিত এবং পরামর্শদায়ী ক্ষমতা থাকে তখনও এমনটি ঘটে। তাদের ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি করা হয় তবে আত্মসাতের পরিমাণ বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক।"[১৪] ডায়না কনিয়ার্সও একই ধরনের আশংকা প্রকাশ করেছেন ঃ "সত্যিকার আসল বিপদটি এই যে, বিকেন্দ্রীকরণের প্রায় সকল রূপই এলিটবর্গের অবস্থানকেই কেবলমাত্র দৃঢ়তর করবে এবং বিরাজমান বৈষম্যকে পরিব্যাপ্ত করবে।"[১৫] অন্যদিকে রণ্ডিনেলী অবশ্য স্বীকার করেন না যে, বিকেন্দ্রীকরণ সর্বদা গ্রামীণ এলিটবর্গকে লাভবান করবে। তাঁর মতে "সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকল্প পন্থা সৃষ্টি করে বিকেন্দ্রীকরণ দৃঢ় অবস্থানে অবস্থিত এবং জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার প্রতি বেদরদী এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বহীন স্থানীয় এলিটবর্গের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণকে নস্যাৎ করতে পারে।"[১৬] এই বিষয়টি প্রমাণসাপেক্ষ এবং শুধুমাত্র তাত্ত্বিকভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়। হাতের কাছে যে সব প্রমাণাদি রয়েছে তাতে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। রণ্ডিনেলী ও চিমা পরিচালিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার নয়টি ঘটনা সমীক্ষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারী সুবিধা ও সেবার ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্রদের অধিকারপ্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি এবং প্রায় অধিকাংশ বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠান জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হয়নি।[১৭] নাওমি কেইডেন এবং এরন উইল্ডাভসকি মনে করেন যে, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রকল্পসমূহ স্থানীয় এলিটবর্গের চাপের মুখে আরো নাজুক হয়ে পড়ে এবং দায়িত্ব বিভাজিত হয়ে পড়ে ; ফলে স্থানীয় এলিট-বর্গ লাভবান হয়।[১৮]

গ্রামীণ দরিদ্ররা যদি তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সঠিকভাবে সংগঠিত না হয় তাহলে বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর হতে পারে না। সরকারের তত্ত্বাবধানে সমবায়ী দল সৃষ্টি করে অবশ্য তা করা যাবে না। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এসব সমবায়গুলো সহজেই স্থানীয় এলিটবর্গের দখলে চলে যায়। গরীবরা যেহেতু সংগঠিতও নয়, সচেতনও নয়, সেজন্য তারা স্থানীয় এলিটবর্গকে প্রতিরোধ করতে পারে না। ফলে, গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে তাঁদের চেতনার মানোন্নয়ন বা পাওলো ফ্রেইরের সুপারিশ মত "সচেতনায়ন"।[১৯] যা হোক, রাষ্ট্রীয় এজেন্সীগুলো এরকম কর্মসূচী বাস্ত-বায়ন করতে পারে না। চেতনার উন্নয়নের যে কোন প্রচেষ্টাই বিরাজমান পরিস্থিতিকে ধ্বংস করে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দেয়। আমলাতন্ত্র স্থানীয় এলিটবর্গের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং গ্রামীণ এলিটবর্গের আধিপত্য নস্যাৎ করার যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। যা হোক, কিছু কিছু এন,জি,ও এ অবস্থা নিরসনে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের সচেতন ও সুসংগঠিত গ্রুপের বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের

দেখা পাওয়া যায়।[৮০] গ্রামীণ বাংলাদেশে এধরনের দলের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে না যদি না দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং ঐকান্তিকতা নিয়ে কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এধরনের সংগঠকদের আসতে হবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে। তাঁদের প্রয়োজন হবে সরকারের পরোক্ষ সাহায্য এবং সমর্থন।

গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে দু'টি প্রধান প্রশাসনিক বিষয় জড়িতঃ দলের কার্যকর বিন্যাস এবং দলের কর্মকাণ্ড। একটা দলের কার্যকর বিন্যাস কেমন হবে তা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক ফলপ্রসূতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাই হবে এর নির্ধারক। প্রথমতঃ একটি কার্যকর দলের বিন্যাস সামাজিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক পার্থক্য যেখানে উল্লেখযোগ্য নয় এবং বিভিন্ন সামাজিক দলের মধ্যে সম্পর্ক যেখানে সুবিন্যস্ত সেখানে বড় দল অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান এবং কার্যকর হতে পারে। কিন্তু যে সমাজে বিরোধ বিদ্যমান, সেখানে বড় দল কাজ করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ছোট দলে দলাসক্তি খুব জোরদার হয়। মনস্তত্ত্ব-বিদগণ যেমনটি বলেছেন, ছোট দল বৃহত্তর সমাজের ঝড় ঝাপটা থেকে ব্যক্তি-মানুষকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী কাঠামো হিসেবে কাজ করতে পারে।[৮১] বাংলাদেশে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষুদ্র এবং সুসংহত দল বৃহৎ ও অসংহত দলের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর! বাংলাদেশের সফল গ্রামোন্নয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একই গ্রামে একটি সুসংহত দল নিয়ে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। কুমিল্লা নিরীক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামে শুধু ক্ষুদে চাষীদের সংগঠিত করেছিল। ব্র্যাকের ক্ষেত্রেও গ্রামে এক থেকে দু'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ সংগঠনে ছোট ছোট দল সংযুক্ত করে। বর্তমানে বাংলাদেশে অধিকাংশ গ্রামেই কোন সংগঠন নেই। এটাকে স্থানীয় সরকারের কোন স্তর বলেও স্বীকৃতি দেয়া হয় না। ফলে, স্থানীয় কর্মকাণ্ডে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের কোন সুযোগই গ্রামীণ দরিদ্রদের নেই।

গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত দলের কর্মকাণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে দু'টি ব্যাপার বিবেচ্য। প্রথমতঃ স্বল্পতর কর্মকাণ্ড সম্বলিত দলের সফল হবার সম্ভাবনা কি বেশী? সমস্ত দলেরই কি একই ধরনের কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া উচিত?

সাধারণতঃ বলা হয় যে, অধিক সংখ্যক কর্মকাণ্ডের দল দু'কারণে অধিক-তর কার্যকর। প্রথমতঃ অধিক সংখ্যক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিক সুফলও অধিক। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের পরিপূর্ণ কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এসব কর্মকাণ্ড বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র ঋণই যথেষ্ট নয় যদি না সদস্যদের অন্যান্য উপকরণ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অধিক সংখ্যক কর্মকাণ্ডের সমস্যা হচ্ছে এই যে, এতোসব কাজ এক সাথে

চালানোর ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্ররা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের সফল কর্মসূচীগুলোর অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে, কোন একটি দলের স্বল্পতম সংখ্যক কর্মকাণ্ড নিয়ে যাত্রা শুরু করা উচিৎ এবং সঞ্চয় ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ঘটানো যেতে পারে।

কোন দলের কর্মকাণ্ড উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না; দল তাদের প্রয়োজনানুসারে তা নির্ধারণ করবে। সেজন্য বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক দলের কর্মকাণ্ডের উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করে না। যা হোক, এ কৌশল সব ধরনের দলের জন্য সঠিক নাও হতে পারে। "চরম দরিদ্র" দলের কাজের ধরন "অচরম দরিদ্র" দলের কাজ কর্মের ধরন থেকে ভিন্নতর হওয়া উচিত। বাংলাদেশে অনেক চরম দরিদ্র লোকজন শুধুমাত্র বেকারই নয় তারা অপুষ্টি এবং মানসিক বৈকল্যের জন্য কর্মক্ষমও নয়।

চরম দরিদ্রদের চেতনার উন্নয়নের উদ্যোগ সফল হয়ে উঠবে না যদি না তার সাথে যোগ করা হয় সরাসরি পুষ্টি প্রকল্প, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য সেবার কর্মসূচী। ফলে বাইরের হস্তক্ষেপের স্তর এবং কর্মকাণ্ডের ধরন বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন ধরনের হওয়া উচিত। অধিকাংশ জাতীয় এজেন্সী দরিদ্রদের জন্য একই ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয়; তাদের ধারণা সমস্ত দরিদ্ররাই একই ধরনের। দরিদ্ররা আসলে "অসমরূপ লোকের সমষ্টি; ভৌগলিক অবস্থান পরিসংখ্যানগত চরিত্র এবং পেশা ইত্যাদি দিক থেকে একদল অপর দল থেকে ভিন্ন।"[৮২]

গ্রামীণ দরিদ্ররা নিজেরা নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পারে না। দরিদ্রদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বাইরের থেকে অনুঘটক একটি এজেন্সীর প্রয়োজন হয়। সরকার সাধারণতঃ এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয় এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের সাফল্য ততই কম হবে যত বড় হবে এর আয়তন। প্রথমতঃ সরকারী সাহায্য পুষ্ট টিসিসিএ-কে,এস,এস পদ্ধতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, যতই এর প্রসার ঘটানো হয়েছে ততই এর সাফল্য সংকুচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এনজিও ও গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ। সরকারের জাতীয় কর্মসূচীগুলোর তুলনায় তাদের সাফল্য অধিক। ক্ষুদ্র অনুঘটক এজেন্সীগুলোর অধিকতর সাফল্যের জন্য তিনটি উপাদান চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর প্রথম উপাদানটিকে ডি,সি, কর্টেন যথার্থই নির্দেশ করেছেন এভাবে—"ক্ষুদ্র শুধু সুন্দরই নয়, প্রায়শঃই এটা অধিকতর কার্যকর।"[৮৩] যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণায় দেখা গেছে যে, বড় প্রতিষ্ঠানের চাইতে ছোট প্রতিষ্ঠান অনেক বেশী উদ্ভাবনী সম্ভাবনাময়। এমনকি বড় বড় কর্পোরেশনও ছোট ছোট স্বাধীন মতাবলম্বী গবেষণা দল সৃষ্টি করে যাতে উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে ধরে রাখা যায়। বড় বড় গ্রাম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে। তৃতীয়তঃ

পল্লী উন্নয়ন এজেন্সীগুলোর ক্ষেত্রে তাদের সম্প্রসারণের সাথে সাথে কর্মকর্তা কর্মচারীদের গুণগত মান হ্রাস পায়। কুমিল্লা নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা তাই দেখিয়েছে। বেলয়ার বলেছেন "সবচে' খারাপ দিক হচ্ছে এই যে, সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে পরিদর্শক ক্যাডার দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠে। কুমিল্লা কর্মসূচীতে পরিদর্শক হচ্ছে প্রধান চরিত্র; তাদের মধ্যে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ পুরো নিরীক্ষার উপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।"[৮৪] চতুর্থতঃ এন,জি,ও-দের মত ছোট ছোট এজেন্সীগুলো সম্পদ এবং মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় রত। অপরপক্ষে পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকারী জাতীয় এজেন্সী-গুলিতে একাধিপত্য বিদ্যমান। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যা বিবেচ্য তা হচ্ছে এই যে, এন,জি,ও বা সরকারী এজেন্সী যাই হোক না কেন তাদেরকে বৃহদায়তন হয়ে উঠার ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত নয়। গুটি কয়েক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে অনেক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সম্ভাবনা অধিকতর।

বিকেন্দ্রীকৃত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং প্রশাস-নিক সমর্থনের উপরই নির্ভরশীল নয় বরং নিরবচ্ছিন্ন এবং সময় মত সম্পদের প্রাপ্তির উপরও নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে স্থানীয় শ্রমকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। স্যার আর্থার লুইসের তত্ত্বমতে শ্রমের সীমাহীন সরবরাহের মাধ্যমে লুক্কায়িত সম্পদের আকর বাংলাদেশে নেই। ফলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেনি। সফল বিকেন্দ্রীকরণের সম্পদের ক্ষেত্রে দু'টো শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকারকে পর্যাপ্ত সম্পদ সরবরাহ করার জন্য সাংবিধানিক ও বৈধ নিশ্চয়তা প্রদান করা দরকার। রাজস্ব ভাগাভাগির ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। সাধারণতঃ জাতীয় সরকার বিরাজমান শর্ত সাপেক্ষে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগায়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন উপায়ে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাকে হ্রাস করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ সামাজিক সেবা (যেমন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা) বিনা মূল্যে দেয়া হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-গুলো ধনী দরিদ্রের পার্থক্য মনে রেখে সমাজের ধনীদেরকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর ফি প্রদানে বাধ্য ক'রে এধরনের কার্যক্রমের আংশিক ব্যয় বহন করতে পারে। বিরাজমান প্রকল্পগুলোর কাঠামো বদল করে অনেক সামাজিক ব্যয় সংকোচন করার সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মূলধন নির্ভর, হাসপাতাল কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী এবং প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় অত্যন্ত অধিক। স্বাস্থ্য কর্মসূচী অধিকতর কার্যকর ও আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে যদি প্রতিকারমূলক ঔষধের পরিবর্তে প্রতিষেধক ঔষধের গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং উচ্চ শিক্ষিত পেশাজীবিদের পরিবর্তে প্যারামেডিকদের উপর জোর দেয়া হয়। লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে ব্যয় সংকোচনের এটা একটা উপায়।

## ৬। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ( জিকে ) ঘটনা সমীক্ষা

বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণ তলিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশের একটি এন,জি,ও—জিকে-র উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছিল। একটি গভীর বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষার জন্য জিকে-কে বাছাই করার পেছনে মূল কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ—

—বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ চরম দরিদ্র এবং তারা অপুষ্টিতে ভোগে। তৃণমূল পর্যায়ে যদি বিকেন্দ্রীকরণের কার্যক্রমের সাথে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম যুক্ত না করা হয় তবে তা লক্ষ্যদলের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাবে না। জিকে প্রতিষেধক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি শিক্ষা এবং প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থবহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে।

—বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রকল্প বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য বীমা স্কীম এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জিকে স্থানীয় সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

—জিকে অবহেলিত গ্রুপ বিশেষ করে মেয়েদের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টায় রত। "পুরুষ শাসিত শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মহিলাদেরকে তাঁদের ঐতিহ্যিক পরাধীনতার চেতনা থেকে মুক্ত করার" পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে জিকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

—জিকে প্রতিনিয়ত শিক্ষারত ; গত চৌদ্দ বছরে গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে জিকে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সারথী এলাকার বাইরেও ক্ষুদ্রাকারে এই মডেলের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে।

—অনুঘটকদের প্রাণচঞ্চল একটি ক্যাডারের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে এটা সফল হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় জিকে মাঠ পর্যায়ের একটি হাসপাতাল হিসেবে কাজ শুরু করে। এ কয় বছরে জিকে-র উদ্দেশ্য বদলেছে—আহত মুক্তিযোদ্ধাদের শুশ্রূষা করার পরিবর্তে জীবনের মৌল প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমাজ পরিবর্তনই এখন তাদের লক্ষ্য। দেশের মুক্তির পর এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পদ্ধতি গড়ে তোলা যাতে একটি বিশেষ এলাকার পুরো জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে সবচে' কম খরচে বেশী সুফল লাভ নিশ্চিত করা যায়, সীমিত সংখ্যক স্বাস্থ্য জনশক্তির নিয়োগের মাধ্যমে যৌথভাবে ও সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যায়। '৮০-র গোড়ার দিকে জিকে খোলাখুলিভাবে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সমাজ উন্নয়নে নিজেকে নিবেদন করে। বর্তমানে জিকে-র নিজের সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে এই যে, এটা "একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা নতুন সমাজ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই সমাজের জন্য দরিদ্র এবং অত্যাচারিতদেরকে লড়াই করতে হবে।"[৮৬] জিকে-র অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রণীত কর্মসূচী কাজ করেনা। অপুষ্টি ও ক্ষুধার সমস্যা আর্থ সামাজিক অবস্থা থেকে আলাদা করে সমাধান করা যাবেনা।

নিম্নোক্ত ধারণাগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে জিকে স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ

(১) পুঁজিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতি দরিদ্রদের সেবা বিতরণ করতে পারে না। বিদ্যমান সরকারী পদ্ধতি বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য গুটি কয়েক শিক্ষিত ডাক্তারের উপর নির্ভরশীল ; এই প্রচেষ্টার প্রতিপূরক হিসেবে কোন মাঠ পর্যায়ের কর্মীর অস্তিত্ব নেই। জিকে-র মৌলিক কৌশলটি হলো জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পেঁৗছে দেয়ার জন্য একদল প্যারামেডিক সৃষ্টি। সীমিত সংখ্যক সাধারণ অসুখের চিকিৎসা করার জন্য প্যারামেডিকদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা যায়।

(২) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি সদর দপ্তরে চিকিৎসা কার্যক্রম চালায়। মাঠে যে সকল রোগ জটিল বলে ধরা পড়ে সেগুলো সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। সকল শিক্ষিত ডাক্তারগণ সদর দপ্তরে অবস্থান করেন। সদর দপ্তরে প্যারা-ম্যাডিকদেরকে শ্রেণীকক্ষ প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। সদর দপ্তরে একটি ছোট হাসপাতালও রয়েছে ; যেসব রোগীকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হয়, তাদেরকে সেখানে রাখা হয়।

(৩) জিকে-র আটটি উপকেন্দ্র রয়েছে। সেখান থেকে মহিলা ও পুরুষ কর্মীরা লোকজনের বাড়ীতে বাড়ীতে সেবা প্রদান করে। একটি উপকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকেন একজন সিনিয়র প্যারামেডিক। অন্যান্য প্যারামেডিকদেরকে নৈমিত্তিক গৃহ পরিদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট গ্রাম বরাদ্দ করা হয়। প্রশিক্ষণরত প্যারামেডিকদেরকে সিনিয়র প্যারামেডিকগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন জিকে সদর দপ্তর থেকে শিক্ষিত ডাক্তার উপকেন্দ্র পরিদর্শনে যান। তিনি জটিল কেইসগুলো দেখেন এবং প্যারামেডিকদের তদারক করেন ও পরিচালনা করেন। বর্তমানে জিকে-র সদর দপ্তর ২টি ও বাইরে ৬টি উপকেন্দ্রে ৫৩ জন প্যারামেডিক কাজ করছে।

(৪) জিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্যারামেডিকদের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গড়ে তুলেছে। জিকে শিক্ষানবিস হিসেবে স্বল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের নিয়োগ করে—যাঁরা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ করেছে বা যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আরো নিচু স্তরের। প্রশিক্ষণটি ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক নয়। ফলে কোন কড়াকড়ি সময়সূচী, কার্যক্রম নেই এতে, এবং পূর্ব নির্ধারিতও নয় এটা। এতে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। নিয়োগের পর পরই একজন শিক্ষানবিসকে একজন সিনিয়র প্যারামেডিকের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। শিক্ষানবিস তাঁর সিনিয়রের কর্মকাণ্ড খুব মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন। এই পর্যবেক্ষণ-কালে শিক্ষানবিস তাঁর সহকর্মীর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেন। হাতে কলমে এই প্রশিক্ষণ বাদেও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ডাক্তার বা সিনিয়র প্যারামেডিক পরিচালিত কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অধিবেশনে যোগ দিতে হয়। এই শিক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত অংশগ্রহণমূলক এবং বক্তৃতা প্রদানের চাইতে আলোচনার উপরই এতে বেশী জোর দেয়া হয়। প্যারা-মেডিকদের প্রশিক্ষণ কোর্সে তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ের মেয়াদ প্রায় এক বছর। প্রথম পর্যায়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী সামগ্রিক চিকিৎসা কার্যক্রমের

প্রচলিত ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা দেয়া হয় কিভাবে রোগীকে পরীক্ষা করতে হয়, প্রশ্ন করতে হয় এবং কেইস নথি লিখতে হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করা এবং সাধারণ অসুখ বিসুখে ব্যবস্থাপত্র লিখন শিক্ষা দেয়া হয়। যখন প্রশিক্ষণার্থী সিনিয়র এবং তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার কর্তৃক বাড়ী বাড়ী একা পরিদর্শনের জন্য এবং ডাক্তারী দায়িত্ব নেয়ার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তখনই তার শিক্ষানবিসকাল সমাপ্ত হয়। প্যারামেডিকদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং অদক্ষতার জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে।

(৫) ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে জিকে-র স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালু করা হয়। প্রথমে পরিবার পিছু ১০·০০ টাকা ভর্তি ফি এবং ২ টাকা মাসিক প্রিমিয়াম দিতে হতো। সব ধরনের অর্থনৈতিক গ্রুপের জন্য একই হার ধার্য করা হয়েছিল। সারথী এলাকায় এই বীমা পরিকল্পনায় শুধুমাত্র শতকরা ৩১ ভাগ পরিবার সাড়া দেয়; ফলে স্কীম ব্যর্থ হয়। দরিদ্রদের বীমা ফি প্রদানের অক্ষমতাই এ ধরনের কার্যক্রমের ব্যর্থতার পেছনে কাজ করেছে। ফলে বীমার হার পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং ভোক্তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন হারে ফি ধার্য করা হয় (সারণী-৫ দেখুন)।

**সারণী—৫**

**জিকে-র স্বাস্থ্য বীমার সংশোধিত হার**

| | বীমার হার | হাসপাতালের হার |
|---|---|---|
| (১) দরিদ্র ঃ ভূমিহীন ও অন্যান্য—যাঁরা দিনে দু'বেলা আহার জুটাতে পারে না | ভর্তি ফি নেই। ঔষধ ও পরিবারের প্রতি সদস্যের ডাক্তার দেখানোর জন্য ০·৫ টাকা। | বিনামূল্যে |
| (২) মধ্য আয় ঃ যাঁরা বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদন করে কিন্তু যাদের কোন উদ্বৃত্ত নেই | পরিবারপিছুভর্তিফি১২টাকা। পরিবার পিছু বার্ষিক নবায়ন ফি ১০ টাকা। প্রতিজনকে ডাক্তার দেখানো—৫ টাকা। | হাসপাতাল ভর্তি ফি ৫ টাকা। চিকিৎসা ফি ১৫ টাকা দৈনিক সিট ভাড়া ২ টাকা। |
| (৩) ধনী ঃ যাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ রয়েছে | পরিবার পিছু ভর্তি ফি ১২ টাকা। পরিবার পিছু বার্ষিক নবায়ন ফি ১০ টাকা এবং জন প্রতি ডাক্তার দেখানোর ফি ১০ টাকা। | হাসপাতাল ভর্তি ফি ১০ টাকা। চিকিৎসা ফি ২৫ টাকা। দৈনিক সিট ভাড়া ৪ টাকা। |

উৎস ঃ এ,টি,এম,শামসুল হুদা "গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতি ঃ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি ঘটনা সমীক্ষা।"

জিকে-র স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান প্রধান সাফল্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) জিকে-র স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচী উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের ১০০ হাজারেরও অধিক লোকজনের নিকট বিস্তৃত করা হয়েছে। দাবী করা হয় যে প্রকল্প এলাকার শতকরা ১০০ ভাগ খানাই স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।

(খ) চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় মোট আবর্তক ব্যয়ের শতকরা ৫৬ ভাগই আদায় করা হয় বীমা এবং অন্যান্য সেবায় প্রাপ্ত ফি থেকে।

(গ) জিকে প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা জাতীয় কর্মসূচীর চাইতে অধিকতর কার্যকর এবং স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ।[৮৭] বিরাজমান সরকারী কর্মসূচীর মূল্যায়নে দেখা যায় যে, সরকারী স্বাস্থ্য সেবার ব্যবহার অত্যন্ত নিম্নমানের।

(ঘ) জিকে প্যারামেডিকগণ সারথী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারেও সফলকাম হয়েছে।

জিকে-র কার্যক্রম শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সেক্টরেই সীমাবদ্ধ নয়। এসব কার্যক্রম আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। জিকে-র নিম্নোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে ঃ

(১) জিকে মহিলা কেন্দ্র। জিকে-র মহিলা কেন্দ্র হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনায়ন কর্মসূচীর একটি সংমিশ্রণ। এটা মহিলাদের বৃত্তি প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়। শুধুমাত্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্যই নয় বরং পুরুষদের চিরাচরিত দাবী—পুরুষরা মহিলাদের চাইতে অধিক কর্মক্ষম—তাকেও মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য এই কেন্দ্র কাজ করে। তাঁদের কর্মকাণ্ডে রয়েছে সাক্ষরতা এবং সচেতনায়ন ক্লাস, সেলাই কর্মসূচী, হস্তশিল্প, কাঠের কাজ, জুতা তৈরী, রুটি তৈরী এবং ছাপাখানা। যা হোক, কেন্দ্রের বাইরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীগণ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

(২) জিকে একটি নিরীক্ষাধর্মী স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছে। স্কুলগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা পদ্ধতি হতে ছিটকে পড়া ছাত্রদের শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় আনা। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষাটির পেছনে যে ধারণা কাজ করে তা হচ্ছে পারিবারিক শ্রমে অংশগ্রহণের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার জন্যই দরিদ্র শিশুদের স্কুলের শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেজন্য, জিকে স্কুল ছাত্রদের পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। গৃহে যে সব শিশুদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে তারা "পরিবারের কাজের সাথে স্কুলের কাজের" সমন্বয় ঘটিয়ে তাদের কর্ম সম্পাদন করে। উদহরণস্বরূপ, ক্লাশে তাঁরা তাঁদের ছোট ভাইবোনদের নিয়ে আসতে পারে অথবা স্কুল থেকে যাবার পথে গোবর কুড়াতে পারে। নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতির জামানত হিসেবে স্কুল ফি সংগ্রহ করা হয়। যাঁরা জিকে স্কুলে আসতে পারে না তাঁদের জন্য গ্রাম স্কুল গড়ে তোলা হয়। মূলতঃ বয়েসী ছাত্ররাই সেসব স্কুল চালায়। জিকে স্কুলের শিক্ষকরা সে সব স্কুল পরিদর্শন করে।

(৩) গণ-খামার এবং ভূমিহীনদের কর্মসূচী। জিকে একটি যৌথ খামার চালায়, যেখানে জিকে সদর দপ্তরের কর্মচারীদেরকে প্রতি সকালে কাজ করতে হয়। এই বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের পেছনে যে যুক্তিটি কাজ করে তা হচ্ছে—বাংলাদেশের কৃষি সমাজে যে শোষণ বিদ্যমান রয়েছে প্রতিদিনকার শারিরীক শ্রমের মাধ্যমে তাঁদের মনে সেই বোধকে জাগরুক রাখা। ১৯৭৭ সালে জিকে ভূমিহীন ও এক একর পর্যন্ত জমির মালিক কৃষকদেরকে লক্ষ্যদল হিসেবে চিহ্নিত করে তার সম্প্রসারণ কর্ম শুরু করে। জিকে ইতিমধ্যে ২ মিলিয়ন টাকাও বিতরণ করেছে। খাই খালাশী ভিত্তিতে জমি কেনার জন্য যৌথ ঋণ নেয়ার জন্যও ভূমিহীন গ্রুপকে উৎসাহিত করা হয়। যা হোক, জমি যৌথভাবে চাষ করা হয় না এবং সবচে' উচ্চ নীলাম ডাককারীকে নিলামে জমি দেয়া হয়।

জিকে একটি সামান্য প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। বর্তমানে একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপ লাভ করেছে। কর্মসূচীর ব্যাপ্তিও শুধু সাভার উপজেলার সারথী এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। জামালপুর জেলার ভাতশালা ও গাজীপুর জেলার শ্রীপুর ও সাটুরিয়া উপজেলায় এই কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে লোকজনকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য জিকে মাতৃভাষায় জার্নাল, বইও প্রকাশ করেছে।

বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও জিকে-র কতগুলো বড় বড় দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমতঃ জিকে-র কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। কথিত আছে যে, জিকে-র গ্রুপ সমূহ তাদের সমস্যার ব্যাপারে বা কেন্দ্রের সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে বাইরের লোকজনের সাথে আলোচনা করে না; এ ব্যাপারে কেন্দ্র থেকে পূর্বানুমতি লাগে।[৮৮] যাহোক, জিকে-র পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে, এলাকার কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এই প্রতিষ্ঠানটিতে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি ও শারিরীক বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বংস করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকৃত গ্রুপের টিকে থাকার একটি অবশ্য পালনীয় পূর্ব-শর্ত। দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য কর্মসূচী ছাড়া অন্য সব কর্মকাণ্ডের সাফল্য খুবই নগণ্য। এত ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানটি পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত নয়। পরিশেষে, টিকে থাকার জন্য এটা এখনো বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। ১৯৭৯ সালের একটি বিশদ নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠানটি তার মূল এবং চলতি ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।[৮৯]

এসব সীমাবদ্ধতা সত্বেও গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বাস্থ্য রক্ষার একটি দক্ষ ও কার্যকর পদ্ধতি সৃষ্টিতে জিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। অনুসরণের জন্য অন্যান্য এজেন্সী এই পদ্ধতির নিম্নলিখিত উপাদানগুলো বিবেচনা করতে পারে ঃ

(১) পুঁজি-নির্ভর চিকিৎসার পরিবর্তে প্যারামেডিকদের উপর নির্ভরশীল প্রাথমিক চিকিৎসা। জিকে-র অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিতরণের ক্ষেত্রে প্যারামেডিকগণ উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তারদের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর। বিরাজমান সামাজিক অবস্থায় যাঁরা বঞ্চিত, বিশেষ করে সেই সব শিশু ও নারীদের

ক্ষেত্রে এটা অধিকতর সত্য। মহিলা প্যারামেডিক নিয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও আশাপ্রদ ফল দেখিয়েছে। প্যারামেডিকদেরকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগও কম ; এতে চিকিৎসার দ্রুত প্রসার ঘটে এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ দরিদ্রদের সমন্বিত প্রকল্পে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতির একটি উপাদান যুক্ত হওয়া উচিত।

(২) হাতে কলমে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ। জিকে-র সফল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি দেখিয়েছে যে, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর। এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীগণকে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি করে। ঐতিহ্যিক ডাক্তারী শিক্ষায় কোন সামাজিক মাত্রা নেই। জিকে পদ্ধতিতে প্যারামেডিকগণ গ্রামীণ দরিদ্রদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা ও সার্বিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে। একজন সিনিয়র প্যারামেডিকের ঘনিষ্ট তত্ত্বাবধান এবং সময় সময় শিক্ষিত ডাক্তারের দিক নির্দেশনা শিক্ষান-বিসদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে। একই সময়ে প্যারামেডিকগণ সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠে। পল্লী উন্নয়ন কর্মীদের আনুষ্ঠানিক, প্রতিষ্ঠান নির্ভর এবং তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণকে জিকে-র পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো উচিত।

(৩) খরচ আদায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বর্তমানে জিকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতির আবর্তক ব্যয়ের (মূল ব্যয় বাদে) শতকরা ৫৬ ভাগ আদায় করে। যা হোক, জিকে-র কার্য পরিচালনা খরচ খুব কম। প্যারামেডিকদের ব্যাপক ব্যবহার, মাথাপিছু স্বল্প হার খরচ এবং জিকে-র নিজের তৈরী সস্তা বর্গীয় ঔষধের জন্য খরচের এই স্বল্পতা। জিকে-র অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, চরম দারিদ্রের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সামাজিক কৃত্যকের খরচ আদায় সম্ভব। যেটা দরকার তা হচ্ছে, সামাজিক সেবার মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির মধ্যে স্তরায়ন, যাতে গ্রামীণ ধনীরা এ ধরনের কার্যক্রমে আনুপাতিকভাবে অধিকতর খরচ বহন করে। সরকারী সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে ধনী এবং দরিদ্রদেরকে একইভাবে বিচার করা উচিত নয় ; দরিদ্রদেরকে ধনীদের চাইতে একটু বেশী সুবিধে দেয়া দরকার।

(৪) শিক্ষণ প্রক্রিয়া। জিকে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে "পূর্ব পরিকল্পিত পদ্ধতি" নিয়ে যাত্রা শুরু করেনি। জিকে কোন তাত্ত্বিক ধারণার উপর গুরুত্ব প্রদান করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি কয়েকটি মাত্র ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল এবং আস্তে আস্তে তা সম্প্রসারিত হয়েছে।

**উপসংহার ও নীতিগত তাৎপর্য :**

বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্রের বিমোচন একটি বেদনাবহ দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হয়ে থাকবে। এরকম ভঙ্গুর সম্পদ ভিত্তি, ব্যাপক বেকারত্ব, দ্রুত বর্ধমান জন-

সংখ্যা এবং শোষণমূলক সামাজিক কাঠামো নিয়ে তার দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা খুব আশাপ্রদ নয়। দরিদ্রদের দরিদ্রতর হবার সম্ভাবনাই অধিক, যদি না বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের কার্যকর অংশ-গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। অতীতে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগকে গ্রামীণ জীবন নিয়ন্ত্রণকারী স্থানীয় এলিটবর্গ নস্যাৎ করে দিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত নেতাদের কাছে যখন ক্ষমতা অর্পণ করা হবে তখন এর প্রধান সুবিধাভোগী হওয়ার সম্ভাবনা এই এলিটবর্গেরই বেশী। দরিদ্ররা যদি তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারে তবে বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে তাঁরা কোন সুফলই পাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দরিদ্রদের কাছে ঈশ্বর প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে আসবে না; রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিকে তাঁদেরকে তা অর্জন করতে হবে। এধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রথম পূর্বশর্ত হচ্ছে দরিদ্রদের চেতনাকে জাগ্রত করা। এটা দরিদ্ররা নিজেরা করতে পারবে না। সচেতনায়নে অনুঘটকদেরকে বাইরে থেকে আসতে হবে। যা হোক, ঐতিহ্যিক আমলাতন্ত্রের যেহেতু গ্রামীণ এলিটবর্গের সাথে স্থায়ী যোগসাজস রয়েছে তাই তারা এ দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং সেই সাথে রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশের দরিদ্ররা সমরূপী নয়। দরিদ্রদের নিজেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রাম বাংলায় শোষণ শুধু ধনী আর দরিদ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; 'অচরম দরিদ্ররাও' "চরম দরিদ্র"দেরকে শোষণ করে। সেজন্য চরম দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। চরম দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডই যথেষ্ট নয়; তাদেরকে পুষ্টি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যাপারে সরাসরি সাহায্য প্রদান করতে হবে। এই পর্যায়ে একটি এন,জি,ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের (জিকে) পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

সাম্প্রতিক অতীতের বাংলাদেশ বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী উন্নয়নের একরাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রত্যক্ষ করেছে। প্রসিদ্ধ কুমিল্লা মডেল কর্তৃক স্থানীয় সরকার ও সমবায়ের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলার একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরি-চালিত হয়েছে। যা হোক, মডেলটির বিভিন্ন উপাদানকে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনকে কাটিয়ে তোলার প্রয়োজনে এর মূল কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ঘটানো হয়নি। মডেলটিকে কোন ক্রমেই সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়া হয়নি। ফলে এটা দায়সারাগোছের উৎপাদন-কেন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসেবেই থেকে গেছে। বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত নীতিমালার বদল ঘটেছে। বৈধতার সংকট প্রায়শঃই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগসমূহকে নস্যাৎ করেছে এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য সরকারও তাকে বিনষ্ট করেছে। এ ব্যাপারে জেলা গভর্নর স্কীম ও

স্বনির্ভর গ্রাম সরকার উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক অতীতে সরকার দু'টি সম্ভাবনাময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে। প্রথমতঃ নির্বাচিত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প প্রমাণ করেছে যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য ব্যাংক সুবিধা প্রদান বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর কর্মকাণ্ডের পরিধি ইচ্ছাকৃতভাবে সীমিত রাখা হয়েছে।

সাফল্যজনক তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এন,জি,ও-রাও কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তারা সচেতনায়ন ও অংশগ্রহণমূলক কর্ম গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে। কিছু কিছু এন,জি,ও লাগসই প্রযুক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। লক্ষ্যদলের কাছে সেবা পৌঁছানের ব্যাপারেও তারা সাফল্য অর্জন করেছে। যা হোক, প্রায় সকল এন,জি,ও-র কর্মকাণ্ডই ছোট ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ। এন,জি,ও এবং অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন এজেন্সীর সাফল্য বিপরীতভাবে এদের আয়তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিকেন্দ্রীকরণকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে ঃ

(১) যতক্ষণ না গ্রামীণ দরিদ্রগণ তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণে সঠিকভাবে সংগঠিত হতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর হবে না। গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং বহিরাগত অনুঘটকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে তাঁদের সংগঠকের। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং স্বেচ্ছাসেবী এজেন্সী সমূহ হতে আসবে এ ধরণের পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট।

(২) বিকেন্দ্রীকরণকে লক্ষ্যার্জনের জন্য একটি উপায় মাত্র বলে বিবেচনা করলে চলবে না। বিকেন্দ্রীকরণকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এ ধরনের মতাদর্শগত প্রতিশ্রুতি বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রমকে রাজনৈতিক অপ-ব্যবহার হতে এবং রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য নীতিমালার বিভ্রান্তিকর পরিবর্তন হতে রক্ষা করবে।

(৩) গ্রামীণ দরিদ্রদের গ্রুপ হওয়া উচিত সমরূপ এবং ছোট ছোট। দরিদ্ররা বড় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

(৪) পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকারী এজেন্সী এবং এন,জি,ওদেরকে খুব বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠার ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত নয়। পল্লী উন্নয়নের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধু মাত্র সুন্দরই নয়; কার্যকরও বটে। গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যকারিতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কিছু বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের চাইতে অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই মঙ্গলকর।

(৫) দরিদ্ররা সমরূপ নয়। চরম দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচী অচরম দরিদ্রদের চাইতে ভিন্নতর হওয়া উচিত। চরম দরিদ্রদের জন্য লাগসই স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতি ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। মহিলা ও শিশুদের মত পশ্চাৎপদ গ্রুপের জন্য বিশেষ ধরনের কর্মসূচী নেওয়া উচিত।

(৬) বাংলাদেশে জিকে এবং ব্র্যাকের অভিজ্ঞতার আলোকে বিদ্যমান এলিটধর্মী ও পুঁজি নির্ভর স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানো উচিত। পুরোপুরি শিক্ষিত পেশাজীবীদের চাইতে প্যারামেডিকদের উপর নির্ভরতা বাড়ানো উচিত।

(৭) সরকারী তহবিল হতে সামাজিক সেবার ব্যয়ভার কমানোর জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিভিন্ন হারে ফি নির্ধারণের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এসব সেবার ক্ষেত্রে যাতে ধনীদেরকে বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয় তার ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

(৮) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অপ্রাতিষ্ঠানিক হাতে কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া উচিত। প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জিকে-র অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ঐতিহ্যিক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগকে নিরূৎসাহিত করা উচিত।

(৯) এন,জি,ওদের ভূমিকা স্পষ্টভাবে বিধৃত করা দরকার। তাদেরকে উদ্ভাবনীমূলক কাজকর্মে উৎসাহিত করা উচিত এবং আমলাতান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখা উচিত।

উপরোল্লিখিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন খুব সহজসাধ্য কাজ হবে না। যথার্থই বলা হয়েছে যে, "সবচাইতে ভালো অবস্থায়ও বিকেন্দ্রীকরণ দুঃসাধ্য। অনেক লোকজন---রাজনীতিবিদ, প্রশাসক, প্রযুক্তিবিদ এমনকি পণ্ডিতবর্গ তাঁদের নিজেদেরকে ক্ষমতা পরিত্যক্ত দেখতে চায় না। স্থায়িত্বহীন ও অনিশ্চিত পরিবেশে ক্ষমতার এই রদবদল আরো দুঃসাধ্য- - - -। একটা প্রকল্প দলিলে কোন ক্রমেই বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা যায় না। যদিও দুর্ভাগ্যজনক তবু সত্য যে, পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণের অত্যন্ত দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া খুব জরুরী বিষয়।[৯০] যাহোক, কর্মের জটিলতা এবং বিপুলতা নিষ্ক্রিয়তার ওজর হওয়া উচিত নয়। পল্লী উন্নয়নের সকল কর্মীরই আদর্শ হওয়া উচিত মার্ক্সের সমাধিতে উৎকীর্ণ সেই বাণী ঃ

> "এতদ্‌পর্যন্ত দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে শুধুমাত্র পৃথিবীকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই করেছেন, যদিও মূল করণীয় হচ্ছে এর পরিবর্তন সাধন।"

## তথ্যপঞ্জী


১। জেফারসনের বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত মতবাদের ব্যাপারে দেখুন, Hannah Arendt, *On Revolution* ( New York : The Viking Press, 1965 ), পৃঃ-২৫-২৫৭।

২। ILO, *Poverty and Landlessness in Rural Asia* (Geneva : ILO, 1977), পৃঃ-১৪৭।

৩। Q.K. Ahmed and M. Hossain, "An Evaluation of selected policies and programmes for the Alleviation of Rural Poverty in Bangladesh, *Strategies for Alleviating Poverty in Rural Asia, ed.* R. Islam (Dhaka and Geneva : BIDS and ILO 1985), পৃঃ-৭০।

৪। S.R. Osmani, *Economic Inequality and Group Welfare* (Oxford Clarendon Press, 1982), পৃঃ-১২৬।

৫। Bangladesh Bureau of Statistics, *Report of the Bangladesh Household Expenditure Survey*, 1981-82 (Dhaka : BBS, 1986), পৃঃ-৪৩।

৬। World Bank, "Bangladesh : Selected Issues in Rural Employment" (World Bank Report No. 4292-BD, 1983), (mimeo), পৃঃ-৪।

৭। Michael Lipton, "Poverty Undernutrition and Hunger" (World Bank Staff Working paper No. 597, 1983), (mimeo), পৃঃ-৩৮।

৮। World Bank, Bangladesh : "Economic and Social Development Prospects" (World Bank Report No. 5409, 1985), পৃঃ-৬১।

৯। Betsy Hartmann and James Boyce, *A Quiet Violence* (Delhi : Oxford University Press, 1983), পৃঃ-৮২।

১০। World Bank "Bangladesh Food and Nutrition Sector Review" (World Bank Report No. 4974-BD, 1985), পৃঃ-১২।

১১। BRAC, *The Net Power Structure in Ten Villages* (Dhaka : BRAC, 1983)

১২। Robert Chambers, *Rural Development : Putting the Last First* (London : Longman, 1983), পৃঃ-১৩৩-১৩৪।

১৩। Jenneke Arens and Jos Van Beurden, *Jagrapur : Poor Peasants and Women in Bangladesh*, (Birmingham : Third World Publications, 1977), পৃঃ-১৫৪।

১৪। Hartmann and Boyce, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৮২।

১৫। International Commission of Jurists and Human Rights Institute, *Rural Development and Human Rights in South Asia*, (Lucknow : Human Rights Institute, 1984), পৃঃ-৩৮-৩৯।

১৬। Gunnar Myrdal, *The Challenge of World Poverty*, (New York : Vintage Books, 1970)

১৭। Michael Kalecki, "Social and Economic Aspects of Intermediate Regimes" in *Selected Essays in the Economic Growth of the Socialist and Mixed Economy*, (Cambridge University Press, 1972).

১৮। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (কলিকাতা লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৮বাং), উদ্ধৃতি,পৃঃ-২০০।

১৯। ঐ, পৃঃ-২০০।

২০। Akhtar Hamid Khan, *The Works of Akhtar Hamid Khan* (Comilla : BARD, 1983) Vol. II, পৃঃ-৫০।

২১। ঐ, পৃঃ-৫২।

২২। ঐ, পৃঃ-৬২-৬৩।

২৩। ঐ, পৃঃ-১২৭।

২৪। ঐ, পৃঃ-৯৯।

২৫। ঐ, পৃঃ-১২২-১২৩।

২৬। ঐ, পৃঃ-৫১।

২৭। ঐ, পৃঃ-১৪৮।

২৮। ঐ, পৃঃ-১১২।

২৯। Harry W. Blair, "The Elusiveness of Equity : International Approaches to Rural Development in Bangladesh (Cornell University : Rural Development Committee, 1974), (mimeo), পৃঃ-১৮-২০।

৩০। Azizur Rahman Khan "The Comilla Model and the Integrated Rural Development Programme of Bangladesh : An Experiment in Cooperative Capitalism," *Agrarian Systems and Rural Development*, ed. Dharam Ghai, *et al* (London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd., 1979), পৃঃ-১২০।

৩১। Blair, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৯।

৩২। Abu Abdullah, M. Hossain and R. Nations, "Issues in Agrarian Development and the IRDP" in SIDA/ILO. Report on IRDP, Dhaka, June 1974 (mimeo), পৃঃ-১৬৪।

৩৩। Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Bangladesh Integrated Rural Development Programme : A Joint Review by Government and the World Bank* (Dhaka, October, 1981), পৃঃ-৬৩।

৩৪। Akhtar Hamid Khan, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫১।

৩৫। Geof Wood, "Rural Development in Bangladesh : Whose Framework ? *The Journal of Social Studies*, Vol. 8, 1980, পৃঃ-১-২৯।

৩৬। Centre for Development Science, "Rural Development in a Cooperative Framework, (An Evaluation of RD-I project in Bangladesh (mimeo), (Dhaka : BRDB, 1983), পৃঃ ৩·১-৩·৫।

৩৭। David C. Korten, "Rural Development Programming : The Learning Process Approach." *"People Centred Development,"* ed. David C. Korten and Rudi Klauss (West Hartford : Kimarion Press, 1984), পৃঃ-১৮১।

৩৮। Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, *The Third Five Year Plan*, 1985-90 (Dhaka : Planning Commission, 1985), পৃঃ-২১১।

৩৯। Abdullah, *et al*, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৯৭।

৪০। Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, পূর্বোক্ত পৃঃ-৩৮

৪১। Centre for Development Studies, পূর্বোক্ত পৃঃ-৯।

৪২। A.R. Khan, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৪৪।

৪৩। A.H. Khan, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৯৭।

৪৪। Centre for Development Studies, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৬৩।

৪৫। Jayanta Kumar Roy, *Organizing Villagers for Self Reliance* (Comilla: BARD, 1983), পৃঃ—৪।

৪৬। ঐ, পৃঃ-৯৩।

৪৭। Mahbub Hossain, *Credit for the Rural Poor* (Dhaka: BIDS, 1984), পৃঃ-১২৪-১৩৩।

৪৮। ঐ, পৃঃ-১২৮।

৪৯। World Bank, Bangladesh Selected Issues in Rural Employment (World Bank Report No. 4292-BD, 1983), (mimeo), পৃঃ-৯৬।

৫০। Government of the People's Republic of Bangladesh, "Report of the Committee for Administrative Reorganization/Reform, 1982" (mimeo), পৃঃ-১৩৮।

৫১। ঐ, পৃঃ–১৩৬।

৫২। Mahbub Hossain, Raisul Awal Mahmood and Qazi Khaliquzzaman Ahmed, "Participatory Development Efforts in Rural Bangladeshs. A Case Study of experience: in three areas" *Studies in Rural Participation*, ed. Amit Bhaduri and Md. Anisur Rahman (Delhi: Oxford and IBH Publishing Co. 1982), পৃঃ-৯০-১২০।

৫৩। Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, "Report of the Committee for Administrative Reorganization/Reform" (mimeo), পৃঃ-১৩৯।

৫৪। Shaikh Maqsood Ali, M. Safiur Rahman and Kshanada Mohan Das, *Decentralization and Peoples' Participation in Bangladesh*, (Dhaka : NIPA, 1983), পৃঃ-১৫০-৩২২।

৫৫। World Bank, Bangladesh : Economic Trends and Development Administration (World Bank Report No. 4822, 1984), vol. I. পৃঃ-১৩৩।

৫৬। G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, *Implementing Decentralization Programme in Asia* (Nagoya : UNCRD, 1983), পৃঃ-১০১।

৫৭। Robert Chambers, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৩১।

৫৮। Atiur Rahman, *Rural Power Structure* (Dhaka : Bangladesh Books International, 1981), পৃঃ-২৭-৩০।

৫৯। Rehman Sobhan, *Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan* (Dhaka : Dhaka University, 1968), পৃঃ-২৩৮।

৬০। D.S. Yusuf Hyder, *Development the Upazila Way* (Dhaka : Dhaka Prokashan, 1986), পৃঃ-১৫৯।

৬১। Akbar Ali Khan, "Conflict and Coordination Problems in Upazila Administration ঃ A Note," *The Young Economist*, BYEA Journal, 1986, পৃঃ-১৬-৩০।

৬২। B.C. Smith, *Decentralization* (London : George Allen and Unwin, 1985), পৃঃ-১৬১।

৬৩। World Bank, *World Development Report* 1985 (New York : Oxford University Press, 1985), পৃঃ-৯৬।

৬৪। External Resources Division, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Annual Report*, 1984-85 (Dhaka : ERD 1986), পৃঃ-৫৮।

৬৫। FRM Hasan, "Processes in Landless Mobilization in Bangladesh Theory and Practice" (Dhaka : BIDS, 1985), পৃঃ-৯২।

৬৬। ঐ, পৃঃ-১০২।

৬৭। Proshika Manobik Unnayan Kendra, *Combating Rural Underdevelopment*, (Dhaka : Proshika, 1983), পৃঃ-৮০-৮৪।

৬৮। F.H. Abed, Rahat Uddin Ahmed, Wit. Treygo, "NGO Efforts and Plans : Development as an Experimental Process" *in Focus on* 50 *Million Poverty in Bangladesh*, ed. K.S. Huda *et al* (Dhaka : ADAB, 1984) পৃ:-৩০।

৬৯। FRM Hasan, পূর্বোক্ত, পৃঃ -১২৯-১৪৩।

৭০। A.Z.M. Obaidullah Khan, *Rural Development in South Asia* (Dhaka : Centre for Development Research, 1983), পৃঃ-২।

৭১। World Bank, *The Assault on World Poverty* (Baltimore : Johns Hopkins, 1975), পৃঃ-৯০-৯৮।

৭২। Dennis A. Rondinelli, Government Decentralization in Comparative Perspective : Theory and Practice in Developing Countries, *International Review of Administrative Science*, Vol. XLVII, 1981 No. 2. পৃঃ-১৩৫-১৩৬।

৭৩। H. Arendt, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৫২।

৭৪। Raj Krishna, "Concepts and Policies of Rural Development," *Rural Development in Asia and the Pacific* (Manila : ADAB, 1985), পৃঃ-৩৮।

৭৫। Diana Conyers, "Decentralization : A Framework for Discussion," *Decentralization, Local Government Institutions and Resource Mobilization*, ed. Hasnat A. Hye Comilla : BARD, 1985), পৃঃ-৩৬।

৭৬। Rondinelli, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৩৬।

৭৭। G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১০০।

৭৮। Naomi Caiden and Asron Wildavsky, Planning and Budgeting in Poor Countries. (New York : John Wiely, 1974), পৃঃ-৮২।

৭৯। Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (Hammondswork : Penguin Books, 1972).

৮০। ঘটনা সমীক্ষার জন্য দেখুন, M. Hossain "Conscietizing Rural Disadvantaged Peasants in Bangladesh : Intervention Through Group Action—A Case Study of Proshika," *Poverty, Productivity and Participation : An Analysis of Some Recent Asian Experiences* (Bangkok : ESCAP, 1982), পৃঃ-১৭-৩৪ এবং Md. Anisur Rahman, "Theory and Practice of Participatory Action Research" (ILO Working papper, August 1983), (mimeo).

৮১। Peter J. Berger and Richard John Neuhaus, "To Empower People Central Development, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫০।

৮২। Keith Griffin, "Rural Poverty in Asia : Analysis and Policy Alternatives" *Strategies for Al-Leviating Poverty in Rural Asia*, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪২।

৮৩। D.C. Korten, "People-Centred Development : Toward a Frameowrk," *People Centred Development*, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩০৩।

৮৪। H.W.Blair, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৭।

৮৫। FRM Hasan, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫২।

৮৬। ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫০।

৮৭। সরকারী কর্মসূচীর সাথে জিকে-র তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন, কামরুল হাসান, "কালিয়াকৈর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা।" কোটা বুলেটিন, নং ৩, ১৯৮১ পৃঃ-৪৫-৫৮।

৮৮। কামরুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৬৫।

৮৯। B.S. Khanna, "Aarticipation of Non Governmental Organizations (NGOs) in Integrated Rural Development : An Overview" (Dhaka : CIRDAP, 1984), (mimeo), পৃঃ-৫৫।

৯০। Obaidulla'ı Khan, পূর্বোক্ত পৃঃ-৬৪।